উৎসব

সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন— এইজন্য উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। একলার উৎসব হইলে চলে না। বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না— তখনই প্রত্যেক খণ্ড পদার্থ, প্রত্যেক খণ্ড ঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই; তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই না, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি— তাহার চরম সত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখনই আমরা দেখিতে পাই—

> নিখিলে তব কী মহোৎসব। বন্দন করে বিশ্ব
> শ্রীসম্পদভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম, উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ— সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে যাহা ধ্যানযোগে বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানা স্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণকরতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা— মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।

মিলনের যে শক্তি, প্রেমের যে প্রবল সত্যতা, তাহার পরিচয় আমরা পৃথিবীতে পদে পদে পাইয়াছি। পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম। স্বার্থপরতাকে আমরা জগতের একটা সুকঠিন সত্য বলিয়া জানিয়াছি, সেই স্বার্থপরতার সুদৃঢ় জালকে অনায়াসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় প্রেম। যে হতভাগ্য দেশবাসীরা পরস্পরের সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়— তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং লাভ করিতে জানে না— তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা। তাহারা পৃথিবীতে নিয়তই ভয়ে ভীত হইয়া, অপমানে লাঞ্ছিত হইয়া, দীনপ্রাণে নতশিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজন্যই কোনোমতেই বল পাইতেছে না। আমরা সত্যকে যে পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি— আমরা ভাইকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, ভাইয়ের জন্য ততখানি ত্যাগ করিতে পারি। আমাদিগকে যে জলস্থল বেষ্টিত করিয়া আছে, আমরা যে-সকল লোকের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি,

যথেষ্ট পরিমাণে যদি তাহাদের সত্যতা অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিব না।

তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যু-পীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

প্রাত্যহিক উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসনদান করে। কারণ, আত্মপর ধনিদরিদ্র পণ্ডিতমূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য— এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসবসম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীনভাবে রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম— ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? আনন্দরূপ-মমৃতং যদ্‌বিভাতি— তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ, অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ; সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ। আমরা তো লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি, অপূর্ণ সত্য অপরিস্ফুট। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিব তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই; তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে; কারণ তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদ্‌পর্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরও পরিপূর্ণ— তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্র সত্য, অস্ফুট সত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ, তাহার প্রেম উদ্‌বোধিত করে। যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অস্ফুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই— কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে তাহাদের মঙ্গলচিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে— এই যে যাহা-কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ হইতেই জাত। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না।

জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলব্ধি। জগৎ আছে, এটুকু সত্য কিছুই নহে; কিন্তু জগৎ আনন্দ, এই সত্যই পূর্ণ।

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে। জগৎপ্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকু মাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই-যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝর্না আকাশময় ঝরিয়া পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে বর্ণে তাপে প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রয়োজন যতটুকু, ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি— ইহা অজস্র। বসন্তকালে লতাগুল্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া, ফুল ফুটিয়া, পাতা গজাইয়া, একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আম্রশাখায় মুকুল ভরিয়া উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশিরাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্তমান বিচিত্র রঙের পাগলামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোনো প্রয়োজন দেখি না— ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রভাতে পাখিদের শত শত কণ্ঠ হইতে উদ্গিরিত স্বরের উচ্ছ্বাসে অরুণ-গগনে যেন চারি দিক হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকৃপণ— সৌন্দর্যে সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্ত পায় না।

উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই— সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য। এইজন্য উৎসবদিনে আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি— প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন

হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈন্যের দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্যের দিন।

আজ সৌন্দর্যের দিন। সৌন্দর্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্যকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ— ইহা প্রেমের ভাষা। ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত— কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্যদানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে— সেই যে বাহুল্য প্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্য প্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কী, আর-কাহারই বা কী। কিন্তু এক দিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য, আর-এক দিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোৎসব— ইহাই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গলীলা।

তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুল-পাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি— উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধিদ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এই দিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন— ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

কিন্তু বলা বাহুল্য উৎসবের এই আয়োজন তেমন দুঃসাধ্য নহে, ইহার উপলব্ধি যেমন দুরূহ। উৎসব অপরূপসুন্দর শতদলপদ্মের ন্যায় যখন বিকশিত হইয়া উঠে তখন আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাঁহারা মধুকরের মতো ইহার সুগন্ধ মধুকোষের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ইহার সুধারস উপভোগ করিতে পারেন? এ দিনেও সম্মিলনকে আমরা কেবল জনতা করিয়া ফেলি, আয়োজনকে কেবল আড়ম্বর করিয়া তুলি। এ দিনেও তুচ্ছ কৌতূহলে আমাদের চিত্ত কেবল বাহিরেই বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। যে আনন্দ অন্তরীক্ষে অন্তহীন জ্যোতিষ্কলোকের শিখায় শিখায় নিরন্তর আন্দোলিত, আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে দীপমালা জ্বালাইয়া আমরা কি সেই আনন্দের তরঙ্গে আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে মিলিত করিয়াছি? আমাদের এই সংগীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে— যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাতপ্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে?

হায়, প্রত্যেক দিনে যে দরিদ্র, এক দিনে সে ঐশ্বর্যলাভ করিবে কী করিয়া? প্রত্যেক দিনে যাহার জীবন শোভা হইতে নির্বাসিত, হঠাৎ এক দিনেই সে সুন্দরের সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া? দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্যে প্রেমে প্রস্তুত হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই উৎসব। হে বিশ্বযজ্ঞপ্রাঙ্গণের উৎসব-দেবতা, আমি কে? আজি উৎসবদিনে এই আসন গ্রহণ করিবার অধিকার আমার কী আছে? জীবনের নৌকাকে আমি যে প্রতিদিন দাঁড় টানিয়া বাহিয়া চলিয়াছি, সে কি তোমার মহোৎসবের সোনাবাঁধানো ঘাটে আসিয়া আজও পৌঁছিয়াছে? তাহার বাধা কি একটি? তাহার লক্ষ্য কি ঠিক থাকে? প্রতিকূল তরঙ্গের আঘাত সে কি সামলাইতে পারিল? দিনের পর দিন

কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? আজ কোথা হইতে সহসা তোমার উৎসবে সকলকে আহ্বানের ভার লইয়া, হে অন্তর্যামিন্‌, আমার অন্তরাত্মা তোমার সমক্ষে লজ্জিত হইতেছে। তাহাকে ক্ষমা করিয়া তুমিই তাহাকে আহ্বান করো। একদিন নহে, প্রত্যহ তাহাকে আহ্বান করো। ফিরাও, ফিরাও, তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ফিরাও। দুর্বল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করো। বুদ্ধির জটিলতার মধ্যে আর তাহাকে নিষ্ফল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্বলোকে, তোমার আনন্দলোকে, তোমার সৌন্দর্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিরজীবনের সমস্ত দৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেলো। যে মহাপুরুষগণ তোমার নিত্যোৎসবের নিমন্ত্রণে আহূত, যাঁহারা প্রতিদিনই নিখিললোকের সহিত তোমার আনন্দভোজে আসনগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বিনম্রনতশিরে তাঁহাদের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে দাও। তাহার মিথ্যা গর্ব, তাহার ব্যর্থ চেষ্টা, তাহার বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি আজই তুমি অপসারিত করিয়া দাও— কাল হইতেই সে যেন নত হইয়া তোমার আসনের সর্বনিম্নস্থানে ধূলিতলে বসিবার অধিকারী হইতে পারে। তোমার উৎসব-সভার মহাসংগীত সেখানে কান পাতিয়া শুনা যাইবে, তোমার আনন্দ-উৎসের রসস্রোত সেখানকার ধূলিকেও অভিষিক্ত করিবে। কিন্তু যেখানে অহংকার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্মও লোকে লুব্ধভাবে গর্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম অভ্যস্ত আচারমাত্রে পর্যবসিত— সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে প্রতিভাত, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার বিশ্বযজ্ঞোৎসবের আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে তোমার সূর্য আলোক দেয় কিন্তু তোমার স্বহস্তলিখিত আলোকলিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না; সেখানে

তোমার উদার বায়ু নিশ্বাস যোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না। সেই উদ্ধত কারাগারের পাষাণপ্রাসাদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করো— তোমার উৎসব-প্রাঙ্গণের ধুলায় তাহাকে লুটাইতে দাও। জগতে কেহই তাহাকে না চিনুক, কেহই না মানুক, সে যেন এক প্রান্তে থাকিয়া তোমাকে চিনে, তোমাকে মানিয়া চলে। এই সৌভাগ্য কবে তাহার ঘটিবে তাহা জানি না, কবে তুমি তাহাকে তোমার উৎসবের অধিকারী করিবে তাহা তুমিই জান— আপাতত তাহার এই নিবেদন যে, এই প্রার্থনাটিও তাহার অন্তরে যেন যথার্থ সত্য হইয়া উঠে— সত্যকে সে যেন সত্যই চায়, অমৃতকে সে যেন মৌখিক যাচ্ঞাবাক্যের দ্বারা অপমান না করে।

মাঘ ১৩১২

দিন ও রাত্রি

সূর্য অস্ত গিয়াছে। অন্ধকার-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যার সীমন্তের শেষ স্বর্ণলেখাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। রাত্রিকাল আসন্ন।

এই-যে দিন এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার অন্ধকারে তালে তালে আঘাত করিয়া যাইতেছে, ইহারা আমাদের চিত্তবীণায় কী রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে? এইরূপে প্রতিদিন আমাদের মধ্যে যে এক অপরূপ ছন্দ রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোনো বৃহৎ অর্থ নাই? আমরা এই-যে অনন্ত গগন-তলের নাড়িস্পন্দনের ন্যায় দিনরাত্রির নিয়মিত উত্থানপতনের অভিঘাতের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছি, আমাদের জীবনের মধ্যে এই আলোক-অন্ধকারের নিত্য গতিবিধির একটা তাৎপর্য কি গ্রথিত হইয়া যাইতেছে না? তটভূমির উপরে প্রতি বর্ষায় যে একটা জলপ্লাবন বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার পরে শরৎকালে সে আবার জল হইতে জাগিয়া উঠিয়া শস্যবপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে— এই বর্ষা ও শরতের গতায়াত তটভূমির স্তরে স্তরে কি নিজের ইতিহাস রাখিয়া যায় না?

দিনের পর এই-যে রাত্রির অবতরণ, রাত্রির পর এই-যে দিনের অভ্যুদয়, ইহার পরম বিস্ময়করতা হইতে আমরা চিরাভ্যাসবশত যেন বঞ্চিত না হই। সূর্য এক সময়ে হঠাৎ আকাশতলে তাহার আলোকের পুঁথি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়, রাত্রি নিঃশব্দ করে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায় বিশ্বলোকের সহস্র অনিমেষ নেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে।

এই অল্প কালের পরিবর্তন কী বিপুল, কী আশ্চর্য। কী অনায়াসে মুহূর্তকালের মধ্যেই বিশ্বসংসার ভাব হইতে ভাবান্তরে পদার্পণ করে। অথচ মাঝখানে কোনো বিপ্লব নাই, বিচ্ছেদের কোনো তীব্র আঘাত নাই; একের অবসান ও অন্যের আরম্ভের মধ্যে কী স্নিগ্ধ শান্তি, কী সৌম্য সৌন্দর্য।

দিনের আলোকে সকল পদার্থের পরস্পরের যে প্রভেদ, যে পার্থক্য, তাহাই বড়ো হইয়া, স্পষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আলোক আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের কাজ করে— আমাদের প্রত্যেকের সীমা পরিস্ফুটরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়। দিনের বেলায় আমরা যে-যার আপন আপন কাজের দ্বারা স্বতন্ত্র, সেই কাজের চেষ্টার সংঘাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধও বাধিয়া যায়। দিনে আমরা সকলেই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজেকে জয়ী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তখন আমাদের আপন আপন কর্মশালাই আমাদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর-সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের চেয়ে বৃহত্তম— এবং নিজ নিজ কর্মোদ্‌যোগের আকর্ষণই জগতের আর-সমস্ত মহৎ আকর্ষণের চেয়ে আমাদের কাছে মহত্তম হইয়া উঠে।

এমন সময় নীলাম্বরা রাত্রি নিঃশব্দ পদে আসিয়া নিখিলের উপরে স্নিগ্ধ করস্পর্শ করিবামাত্র আমাদের পরস্পরের বাহ্য প্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে— তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য তাহাই অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ ঘটে। এইজন্য রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।

ইহাই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিলে জানিব— দিন আমাদিগকে যাহা দেয় রাত্রি শুদ্ধমাত্র যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে; অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে— তাহারও দিবার জিনিস আছে, এবং যাহা দেয় তাহা মহামূল্য। সে যে কেবল

সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে, আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান, সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।

শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে, সে চঞ্চল; প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে, সে স্থির। আমাদের চিত্ত যাহাদিগকে ভালোবাসে, সংসারে কেবল তাহাদেরই মধ্যে সে বিরামলাভ করে; আমাদের চিত্ত যখন বিশ্রামের অবকাশ পায়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসিতে পারে। জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম তাহা প্রেম; প্রেমহীন যে বিরাম তাহা জড়ত্বমাত্র।

এই কারণে কর্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে; স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভুভৃত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুদের মিলনই সম্পূর্ণ মিলন। বন্ধুত্বের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হয়— তাহাতে কর্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।

এইজন্য দিবাবসানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্মের বেগ যখন শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্মের সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে, তখন আমাদের স্নেহপ্রেম সহজ হয়, আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।

তাই বলিতেছিলাম, রাত্রি যে কেবল হরণ করে তাহা নহে, সে দানও করে। আমাদের এক যায়, আমরা আর পাই; এবং যায় বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি। দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের

শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিভূত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্তৃত্ব-অভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে খর্ব করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে-পরিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জ্বলরূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।

এইজন্য রাত্রিই উৎসবের বিশেষ সময়। এখন বিশ্বভুবন অন্ধকারের মাতৃকক্ষে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যে অন্ধকার হইতে জগৎচরাচর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে অন্ধকার হইতে আলোকনির্ঝরিণী নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উদ্‌যোগ নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, সমস্ত ক্লান্তি সুপ্তিসুধার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যে নিস্তব্ধ মহান্ধকার গর্ভ হইতে এক-একটি উজ্জ্বল দিবস নীলসমুদ্র হইতে এক-একটি ফেনিল তরঙ্গের ন্যায় একবার আকাশে উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদ্রের মধ্যে শয়ান হইতেছে, সেই অন্ধকার আমাদের নিকট যাহা গোপন করিতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে। সে না থাকিলে লোকলোকান্তরের বার্তা আমরা পাইতাম না, আলোক আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিত।

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণ-সিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া

উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গনপাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখে না, শোনে না, তখনই নিবিড়তরভাবে মাতাকে অনুভব করে; সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক— স্তব্ধ অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অনুভব করি। তখন নিজের অভাব নিজের শক্তি নিজের কাজ বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড-খণ্ড পৃথক-পৃথক করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া নিখিলের নিশ্বাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিত্যজাগ্রত নিখিলজননীর অনিমেষ দৃষ্টি আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।

আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃতনিগূঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননী-কক্ষের উৎসব। এখন আমরা কাজের কথা ভুলি, সংগ্রামের কথা ভুলি, আত্মশক্তি-অভিমানের চর্চা ভুলি, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখচ্ছবির ভিখারি হইয়া দাঁড়াই; বলি, জননী, যখন প্রয়োজন ছিল, তখন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন, কর্মের শক্তি, পথের পাথেয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম— কিন্তু এখন সমস্ত প্রয়োজনকে বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া তোমার এই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখন একান্ত তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে এখন আর হাত পাতিব না— কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ করো, মার্জনা করো, গ্রহণ করো। তোমার রজনী-মহাসমুদ্রে অবগাহন-স্নান করিয়া বিশ্বজগৎ যখন কাল উজ্জ্বলবেশে নির্মলললাটে প্রভাত-আলোকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন যেন আমি তাহার সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি— তখন যেন আমার

গ্লানি না থাকে, আমার ক্লান্তি দূর হয়; তখন যেন আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি, সকলের কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক; যেন বলিতে পারি, সকলের মধ্যে যিনি আছেন তাঁহাকে আমি দেখিতেছি— তাঁহার যাহা প্রসাদ, তিনি অগ্ন সমস্তদিন আমাকে যাহা দিবেন, তাহাই আমি ভোগ করিব, আমি কিছুতেই লোভ করিব না।

প্রাতঃকালে যিনি আমাদের পিতা হইয়া আমাদিগকে কর্মশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মাতা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি আমাদিগকে ভার দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভার লইতেছেন। প্রত্যহই দিনে রাত্রে এই-যে দুই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন আন্দোলিত হইতেছে— একবার পিতা আমাদিগকে বহির্দেশে পাঠাইতেছেন, একবার মাতা আমাদিগকে অন্তঃপুরে টানিতেছেন; একবার নিজের দিকে ধাবিত হইতেছি, একবার অখিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি; ইহার মধ্যে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহস্যচ্ছবি আলোক-অন্ধকারের তুলিকাপাতে প্রতিদিন বিচিত্র হইতেছে।

আমাদের কাব্যে-গানে আয়ু-অবসানের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি— কিন্তু সকল সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ংগম করি না; আমরা কেবল অবসানেরই দিকটা দেখিয়া বিষাদের নিশ্বাস ফেলি, পরিপূরণের দিকটা দেখি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি না, প্রত্যহ দিবাবসানে এত বড়ো যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন-একটা বিপর্যয়দশা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে তো কিছুই বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া তো হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশ্বের আরামেরই নিশ্বাস পড়িতেছে।

দিবস আমাদের জীবনেরই প্রতিকৃতি বটে। দিনের আলোক যেমন আর-সমস্ত লোককে আবৃত করিয়া আমাদের কর্মস্থান এই পৃথিবীকেই একমাত্র জাজ্বল্যমান করিয়া তুলে, আমাদের জীবনও আমাদের চতুর্দিকে তেমনি একটি বেষ্টন রচনা করে— সেইজন্যই আমাদের জীবনের অন্তর্গত যাহা-কিছু তাহাই আমাদের কাছে এত একান্ত, ইহার চেয়ে বড়ো যে আর-কিছু আছে তাহা সহসা আমাদের মনেই হয় না। দিনের বেলাতেও তো আকাশ ভরিয়া জ্যোতিষ্কলোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে পাই কই? যে আলোক আমাদের কর্মস্থানের ভিতরে জ্বলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্য-সমস্তকে দ্বিগুণতর অন্ধকারময় করিয়া রাখে। তেমনি আমাদের এই জীবনকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া শতসহস্র জ্যোতির্ময় বিচিত্র রহস্য নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কই? যে চেতনা, যে বুদ্ধি, যে ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে আমাদের মনোযোগকে প্রবল করিয়া তোলে, সেই জ্যোতিই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমস্তই আমাদের নিকট অগোচর রাখিয়া দেয়।

জীবনে যখন আমরাই কর্তা, যখন সংসারই সর্বপ্রধান, যখন আমাদের সুখদুঃখচক্রের পরিধি আমাদের আয়ুকালের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, এমন সময় দিন অবসান হইয়া যায়, জীবনের সূর্য অস্তাচলের অন্তরালে গিয়া পড়ে, মৃত্যু আমাদিগকে অঞ্চলে আচ্ছন্ন করিয়া কোলে তুলিয়া লয়। তখন সেই-যে অন্ধকারের আবরণ, সে কি কেবলই অভাব, কেবলই শূন্যতা? আমাদের কাছে কি তাহার একটি সুগভীর ও সুবিপুল প্রকাশ নাই? আমাদের জীবনাকাশের অন্তরালে যে অসীমতা নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে, মৃত্যুর তিমিরপটে তাহা কি দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দিকে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে না?

তখন কি সহসা আমাদের এই সীমাবচ্ছিন্ন জীবনকে অসংখ্য জীবন-লোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই না? দিবসের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যাকাশে যখন সমস্ত গ্রহদলের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত করিয়া জানিতে পারি তখন সমস্তটির যেমন একটি বৃহৎ ছন্দ, একটি প্রকাণ্ড তাৎপর্য আমাদের চিত্তের মধ্য প্রসারিত হইয়া উঠে, তেমনি মৃত্যুর পরে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত আমাদের জীবনের বিপুল তাৎপর্য কি আমাদের কাছে অতি সহজেই প্রকাশিত হয় না? জীবিতকালে যাহাকে আমরা একক করিয়া, পৃথক করিয়া দেখি, মৃত্যুর পরে তাহাকেই আমরা বিরাটের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই। আমাদের জীবনের চেষ্টা, আমাদের জীবিকার সংগ্রাম যখন ক্ষান্ত হইয়া যায়, তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতায় আমরা আপনাকে অসীমেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই— নিজের ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নহে, নিজের সংসারগত শক্তির মধ্যে নহে।

এইরূপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ, দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ, কর্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ, পরস্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মানুভূতি।

শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে, প্রেম আপনাকে আবৃত রাখে। শক্তির ক্ষেত্র আলোক, প্রেমের ক্ষেত্র অন্ধকার। প্রেম অন্তরালের মধ্য হইতেই পালন করে, লালন করে, অন্তরালের মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া আনে। বিশ্বের সমস্ত ভাণ্ডার বিশ্বজননীর গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে তাই আমরা কিছুই জানি না কোথা হইতে এই নিঃশেষবিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোথা হইতে এই অনির্বাণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জ্বলিয়া উঠিতেছে, কোথা হইতে এই নিত্যসঞ্জীবিত ধীশক্তি চিত্তে চিত্তে জাগ্রত হইতেছে। আমরা জানি না

এই পুরাতন জগতের ক্লান্তি কোথায় দূর হয়, জীর্ণ জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন্ অমৃত-করস্পর্শে মুছিয়া গিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য লাভ করে; জানি না কণা-পরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। জগতের এই-যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্‌যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে, সমস্ত চেষ্টা বিরামলাভ করিয়া যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ। সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত, আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চল শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য—জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতি মুহূর্তে বলপ্রেরণ, প্রতি মুহূর্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে।

হে মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনী, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায় শাবকদিগকে সুকোমল স্নেহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ; তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরম স্পর্শ নিবিড়ভাবে নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে চাহি। তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিক, আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলুক, আমাদের নিজের কর্তৃত্বপ্রয়োগের অহংকারসুখকে খর্ব করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান করুক।

হে বিরামবিভাবরীর ঈশ্বরী মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। আমি এখন আর কোনো ভয় করিব না, কেবল আপন ভার তোমার দ্বারে বিসর্জন দিব; কোনো চিন্তা করিব না, কেবল চিত্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ

করিব ; কোনো চেষ্টা করিব না, কেবল তোমার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছাকে বিলীন করিব ; কোনো বিচার করিব না, কেবল তোমার সেই আনন্দে আমার প্রেমকে নিমগ্ন করিয়া দিব, যে

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।

ওই দেখিতেছি, তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতীরূপে একত্র সমবেত হইয়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকৃত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল-বৃহৎ রূপে দেখা দেয়। কিন্তু আকাশের ওই-যে নক্ষত্রসকল, যাহাদের উদ্দাম বেগ আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না, যাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোকতরঙ্গের আলোড়ন আমাদের কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া দেয়, তোমার মধ্যে তাহাদের সেই প্রচণ্ড আন্দোলন তো কিছুই নহে ; তোমার অন্ধকার বসনাঞ্চলতলে তোমার অবনত স্থির দৃষ্টির নিম্নে তাহারা স্তন্যপাননিরত সুপ্ত শিশুর মতো নিশ্চল নিস্তব্ধ। তোমার বিরাট ক্রোড়ে তাহাদের অস্থিরতাও স্থিরত্ব, তাহাদের দুঃসহ তীব্র তেজ মাধুর্যরূপে প্রকাশমান। ইহা দেখিয়া এ রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যের আস্ফালন, আমার ক্ষণিক তেজের অভিমান, আমার ক্ষুদ্র দুঃখের আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না ; তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত আবৃত করিলাম, সমস্ত শান্ত করিলাম ; তুমি আমাকে গ্রহণ করো, আমাকে রক্ষা করো—

যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

আমি এখন তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি না, আমাকে প্রেম দাও ; আমি সংসারে জয়ী হইতে চাহি না, তোমার নিকট প্রণত হইতে চাই ; আমি সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতে চাহি না, সুখদুঃখকে

তোমার মঙ্গলহস্তের দান বলিয়া বিনয়ে গ্রহণ করিতে চাই। মৃত্যু যখন আমার কর্মশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া নীরব সংকেতে আহ্বান করিবে তখন যেন তাহার অনুসরণ করিয়া, জননী, তোমার অন্তঃপুরের শান্তিকক্ষে নিঃশঙ্ক হৃদয়ের মধ্যে আমি ক্ষমা লইয়া যাই, প্রীতি লইয়া যাই, কল্যাণ লইয়া যাই— বিরোধের সমস্ত দাহ যেন সেদিন সন্ধ্যাস্নানে জুড়াইয়া যায়, সমস্ত বাসনার পঙ্ক যেন ধৌত হয়; সমস্ত কুটিলতাকে যেন সরল, সমস্ত বিকৃতিকে যেন সংস্কৃত করিয়া যাইতে পারি। যদি সে অবকাশ না ঘটে, যদি ক্ষুদ্র বল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবু তোমার বিশ্ববিধানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া যেন দিন হইতে রাত্রে, জীবন হইতে মৃত্যুতে, আমার অক্ষমতা হইতে তোমার করুণার মধ্যে একান্তভাবে আত্মবিসর্জন করিতে পারি। ইহা যেন মনে রাখি— জীবনকে তুমিই আমার প্রিয় করিয়াছিলে, মরণকেও তুমিই আমার প্রিয় করিবে; তোমার দক্ষিণহস্তে তুমি আমাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলে, তোমার বামহস্তে তুমি আমাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইবে; তোমার আলোক আমাকে শক্তি দিয়াছিল, তোমার অন্ধকার আমাকে শান্তি দিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাঘ ১৩১০

মনুষ্যত্ব

'উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!' উত্থান করো, জাগ্রত হও— এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না— কিন্তু 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' এই বাক্য বারবার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা প্রত্যেক দুঃখ প্রত্যেক বিচ্ছেদ কতশতবার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া যে ঝংকার দিয়াছে তাহাতে কেবল এই বাণীই ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'— উত্থান করো, জাগ্রত হও। অশ্রুশিশিরধৌত আমাদের নবজাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে— কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে।

পুষ্পকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হয় নাই যে, 'রজনী প্রভাত হইল, তুমি আজ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠো!' বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে গন্ধে শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। পুষ্প আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অন্য-কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোনো অবস্থায় দ্বিধার লক্ষণ দেখায় নাই, সহজ সার্থকতায় আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জন্মে যে, আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দকিরণপাতে এমনি সহজে, এমনি সম্পূর্ণভাবে

বিকশিত হইয়া উঠে না। সে তাহার সমস্ত দলগুলি সংকুচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কী আঁকড়িয়া রাখিতেছে? প্রভাতে তরুণ সূর্য আসিয়া অরুণ করে তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে; বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার চম্পককিরণরাজি সমস্ত আকাশময় মেলিয়া দিয়াছি, তুমি তেমন সহজে আনন্দে বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে অবাধিত করিয়া দাও।' রজনী নিঃশব্দ পদে আসিয়া স্নিগ্ধ হস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনি করিয়া একবার অন্তরের গভীর তলের দ্বার নিঃশব্দে উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও— আত্মার প্রচ্ছন্ন রাজভাণ্ডার এক মুহূর্তে বিস্মিত বিশ্বের সম্মুখীন করো।' নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে, 'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্পণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো; এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধরো।'

কিন্তু বাধার অন্ত নাই— প্রভাতের ফুলের মতো করিয়া এমন সহজে এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আবৃত করিয়া রাখি, চারি দিকে নিখিলের আনন্দ-অভ্যুদয় ব্যর্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে, ব্যর্থ হইতে থাকে? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত জীবন রহিয়াছে তাহার সফলতার পরিমাণ কে করিতে পারে? পুষ্পের মতো আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা নহে। নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কত কত পর্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন সুদীর্ঘ যাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে,

কোনো কালে তাহার অন্ত থাকে না— তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না— মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সফলতা সহজ নহে। নদীর ন্যায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে, নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কূল গড়িয়া কোনো কূল ভাঙিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা-দ্বারা আবর্তবেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে; অবশেষে যখন সে আপনার সীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান একের সহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয়। বাধা যদি না থাকিত তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না, বৃহৎ না হইলে বিরাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না।

দুঃখ আছে— সংসারে দুঃখের শেষ নাই। সেই দুঃখের আঘাতে, সেই দুঃখের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন-গড়ন চলিতেছে— ইহাতে অহরহ যে তরঙ্গ উঠিতেছে তাহার কতই ধ্বনি, কতই বর্ণ, কতই গতিভঙ্গিমা। মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মতো অসংগত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহত্তেরই গৌরব দুঃখ। বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্, অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখসীমা সংকীর্ণ; মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা অনির্বচনীয়— এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না।

এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্বসম্বন্ধে জাগ্রত সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী

করিয়া তোলে। কারণ,

ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি— অল্পে আমাদের আনন্দ নাই।

যাহাতে আমাদের খর্বতা, আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের, তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না; যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে, সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না, যদি তাহা সুলভ হইত তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়বিপদের দ্বারা দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয়। ইহাতেই সে জানিতে পায়, দুঃখের ঊর্ধ্বে তাহার মস্তক, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে তাহার প্রতিষ্ঠা। এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখবাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়— ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

এই আত্মা (জীবাত্মাই বল', পরমাত্মাই বল'), ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন।

সমগ্র শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার যত উপলক্ষ্য ঘটে ততই

আত্মাকে প্রকৃতভাবে লাভ করিবার উপায় হয়।

এইজন্যই পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এইজন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে,

> উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।
> উঠ, জাগো, যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া বোধলাভ করো।
> সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন।

অতএব প্রভাতে যখন বনে উপবনে পুষ্প পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা, তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ, আপন দুঃসহ দুঃখ, আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখির গান এবং ছায়ালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার— তাহার সংগ্রামক্ষেত্র— সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখদুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে— কারণ মানুষ মহৎ, কারণ মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।

কিন্তু সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের শেষ দেখি তবে দুঃখকষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে? কেনই বা বহন করিবে? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরমবিরাম সমুদ্র, অন্য দিকে সুদীর্ঘতটনিরুদ্ধ

অবিরাম-যুধ্যমান জলধারা, তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে এক দিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অন্য দিকে সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে, তবে এই গতির কোনোই তাৎপর্য থাকে না, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অদ্ভুত উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি। শাস্ত্র বলিয়াছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ

> যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—
> যে-যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে এক দিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্য দিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয় সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতি ক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি।

প্রেম তো কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব যদি একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জন দিতাম কী? তবে ভক্তি তাহার সার্থকতালাভ করিত কেমন করিয়া? সংসারেই আমাদের কর্ম আমাদের কর্তৃত্ব, তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে— যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের; সে কর্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতি ক্ষণেই মুক্তিলাভ করিতেছে; এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানা দুঃখের এক আনন্দ-অবসান— ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম করিব, সকল কর্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম এবং মুক্তি একই কথা

হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত দুঃখের ঝংকার একটি আনন্দসংগীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয় ততই তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ দুঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ— প্রীতিমাত্রই কষ্টদ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে তখন আমাদের সংসারধর্ম দুঃখক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলংকৃত করিবে; ব্রহ্মের প্রতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে দুঃখের মূল্যেই মূল্যবান করিয়া তুলিবে।

হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আমার দৃষ্টি শ্রবণ চিন্তা, আমার সমস্ত কর্ম, তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে, ইহা আমি জানি না বলিয়াই, ইহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই দুঃখ পাই। আমি সমস্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্বক আমার বলিতে চাই— বল রক্ষা হয় না, আমার কিছুই থাকে না। নিখিলের দিক হইতে, তোমার দিক হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া টানিয়া রাখিবার নিষ্ফল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি। আজ আমি আর কিছুই চাই না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না; আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্মের দ্বারা তোমার যে সেবা করিব তাহা নিরন্তর হইয়া আমার প্রেমকে জাগ্রত নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুক, তোমার অমৃতসমুদ্রের মধ্যে অতলস্পর্শ যে বিশ্রাম তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পদ্মের ন্যায় বিশ্বজগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করো।

ফাল্গুন ১৩১৮

ধর্মের সরল আদর্শ

আমার গৃহকোণের জন্য যদি একটি প্রদীপ আমাকে জ্বালিতে হয়, তবে তাহার জন্য আমাকে কত আয়োজন করিতে হয়— সেটুকুর জন্য কত লোকের উপর আমার নির্ভর। কোথায় সর্ষপবপন হইতেছে, কোথায় তৈলনিষ্কাশন চলিতেছে, কোথায় তাহার ক্রয়বিক্রয়, তাহার পরে দীপসজ্জারই বা কত উদ্‌যোগ— এত জটিলতায় যে আলোকটুকু পাওয়া যায় তাহা কত অল্প। তাহাতে আমার ঘরের কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তোলে।

বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারও উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না— তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না; কেবলমাত্র জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

যদি কেহ বলে, প্রভাতের আলোককে দর্শন করিবার জন্য একটি অত্যন্ত নিগূঢ় কৌশল কোথাও গুপ্ত আছে, তবে তৎক্ষণাৎ এই কথা মনে হয়, নিশ্চয় তাহা প্রভাতের আলোক নহে— নিশ্চয় তাহা কোনো কৃত্রিম আলোক— সংসারের কোনো বিশেষব্যবহারযোগ্য কোনো ক্ষুদ্র আলোক। কারণ, বৃহৎ আলোক আমাদের মস্তকের উপরে আপনি বর্ষিত হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র আলোকের জন্যই অনেক কল-কারখানা প্রস্তুত করিতে হয়।

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম। তাহাও এইরূপ অজস্র, তাহা এইরূপ সরল। তাহা ঈশ্বরের আপনাকে দান— তাহা নিত্য, তাহা ভূমা; তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া, আমাদের অন্তর বাহিরকে

ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল। আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদ্‌যোগ করিয়া পাইতে হইলে যেমন আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনন্তজীবনের সম্বল ধর্মকে বিশেষ আয়োজনের দ্বারা পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনোকালে ঘটিয়া উঠিত না।

আমরা নিজে যাহা রচনা করিতে যাই, তাহা জটিল হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ জটিল, আমাদের সংসার জটিল, আমাদের জীবনযাত্রা জটিল। এই জটিলতা আপন বহুধাবিভক্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা অনেক সময় বিপুলতা ও প্রবলতার ভান করিয়া আমাদের মূঢ় চিত্তকে অভিভূত করিয়া দেয়। যে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত ঘোরালো, আমাদের অজ্ঞ বুদ্ধি তাহার মধ্যেই বিশেষ পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়া বিস্ময় অনুভব করে। যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরূহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কল-কারখানা আয়োজন-উপকরণ বহুলবিস্তৃত, তাহা আমাদের দুর্বল অন্তঃকরণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান ; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা ; পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা-দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়াকর্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময়

জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক এক নূতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি-অমঙ্গলের আর সীমা নাই।

এমন হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ, সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া, ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যকদ্রব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব করিয়া লই বলিয়া।

ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই-জন্যই তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই তাহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত, তাহা নিরঞ্জন বিকারবিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের চিরদিনের পক্ষে, আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে এত একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব অবলম্বন দান করে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে তো? ধারণা করিতে হইলে তাহাকে আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। অথচ মানব-প্রকৃতি বিচিত্র, সুতরাং সেই বৈচিত্র্য অনুসারে যাহা এক তাহা অনেক হইয়া উঠে। যেখানে অনেক সেখানে জটিলতা অনিবার্য, যেখানে জটিলতা সেখানে বিরোধ আপনি আসিয়া পড়ে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে না। ধর্মরাজ ঈশ্বর ধারণার অতীত। যাহা ধারণা করি তাহা তিনি নহেন; তাহা আর-কিছু, তাহা ধর্ম নহে, তাহা সংসার। সুতরাং তাহাতে সংসারের সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। সংসারের লক্ষণ বৈচিত্র্য, সংসারের লক্ষণ বিরোধ।

যাহা ধারণা করিতে পারি তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইয়া যায়, যাহা ধারণা করি তাহাতে প্রতি ক্ষণে বিকার ঘটিতে থাকে। সুখের আশাতেই আমরা সমস্ত-কিছু ধারণা করিতে যাই, কিন্তু যাহা ধারণা করি তাহাতে আমাদের সুখের অবসান হয়। এইজন্য উপনিষদে আছে,

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই।

সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণাযোগ্য করিবার জন্য অল্প করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখসৃষ্টি করিবে— দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কী করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত জড়িত করিলে চলিবে না।

একটি উদাহরণ দিই। গৃহ আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের বাসযোগ্য। মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে সেরূপ বাসযোগ্য নহে। কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। মুক্ত আকাশের সহিত আমাদের গৃহস্থিত আকাশের অবাধ যোগ রাখিলেই তবেই আমাদের গৃহ আমাদের পক্ষে কারাগার, আমাদের পক্ষে কবরস্বরূপ হয় না। কিন্তু যদি বলি 'আকাশকে গৃহেরই মতো আমার আপনার করিয়া লইব', যদি আকাশের মধ্যে কেবলই প্রাচীর তুলিতে থাকি, তবে তাহাতে আমাদের গৃহেরই বিস্তার ঘটিতে থাকে, মুক্ত আকাশ দূর হইতে সুদূরে চলিয়া যায়। আমরা যদি বৃহৎ ছাদ পত্তন করিয়া সমস্ত আকাশকে আমার আপনার করিয়' লইলাম বলিয়া কল্পনা করি, তবে আলোকের জন্মভূমি, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের অনন্ত ক্রীড়াক্ষেত্র আকাশ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করি। যাহা নিতান্ত সহজেই পাওয়া যায়, সহজে ব্যতীত আর-কোনো উপায়ে যাহা পাওয়া যায় না, নিজের প্রভূত চেষ্টার দ্বারাতেই তাহাকে একেবারে দুর্লভ

করিয়া তোলা হয়। বেষ্টন করিয়া লইয়া সংসারের আর-সমস্ত পাওয়াকে আমরা পাইতে পারি— কেবল ধর্মকে, ধর্মের অধীশ্বরকে বেষ্টন ভাঙিয়া দিয়া আমরা পাই। সংসারের লাভের পদ্ধতি-দ্বারা সংসারের অতীতকে পাওয়া যায় না। বস্তুত যেখানে আমরা না-পাইবার আনন্দের অধিকারী, সেখানে পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমরা হারাই মাত্র। সেইজন্য ঋষি বলিয়াছেন,

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা-জাল-দ্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—

তিনিই সত্য, নতুবা এ জগৎসংসার কিছুই সত্য হইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা-কিছু তাহা তাঁহারই জ্ঞান; তিনি যাহা জানিতেছেন তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনি অনন্ত। তিনি অনন্ত সত্য, তিনিই অনন্ত জ্ঞান।

এই বিচিত্র জগৎসংসারকে উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ্ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই— একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকার জটিলতা,

সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে?

উপনিষদের এই ব্রহ্ম আমাদের অগম্য, এই কথা নির্বিচারে উচ্চারণ করিয়া ঋষিদের অমর বাণীগুলিকে আমরা যেন আমাদের ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া না রাখি। আকাশ লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া আমরা আকাশকে দুর্গম বলিতে পারি না। বস্তুত সেই কারণেই তাহা সুগম। যাহা ধারণাযোগ্য, যাহা স্পর্শগম্য, তাহাই আমাদিগকে বাধা দেয়। আমাদের স্বহস্তরচিত ক্ষুদ্র প্রাচীর দুর্গম, কিন্তু অনন্ত আকাশ দুর্গম নহে। প্রাচীরকে লঙ্ঘন করিতে হয়, কিন্তু আকাশকে লঙ্ঘন করিবার কোনো অর্থই নাই। প্রভাতের অরুণালোক স্বর্ণমুষ্টির ন্যায় সঞ্চয়যোগ্য নহে, সেই কারণেই কি অরুণালোককে দুর্লভ বলিতে হইবে? বস্তুত একমুষ্টি স্বর্ণই কি দুর্লভ নহে? আর, আকাশপূর্ণ প্রভাতকিরণ কি কাহাকেও ক্রয় করিয়া আনিতে হয়? প্রভাতের আলোককে মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার কল্পনাই মনে আসিতে পারে না— তাহা দুর্মূল্য নহে, তাহা অমূল্য।

উপনিষদের ব্রহ্ম সেইরূপ। তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র; তিনি অন্তরতম, তিনি সুদূরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন।

মহাকাশ পূর্ণ করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই আমরা প্রতিক্ষণে নিশ্বাস লইতেছি, আমরা প্রতিমুহূর্তে প্রাণ

ধারণ করিতেছি—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

এই আনন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্যান্য জীবসকল উপভোগ করিতেছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই-সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে; সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই-সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে; সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষা সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ। ব্রহ্মের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছু কল্পনা করিতে হয় না, কিছু রচনা করিতে হয় না, দূরে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয় না— হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয়-উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।

আমি একদা একখানি নৌকায় একাকী বাস করিতেছিলাম। একদিন সায়াহ্নে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শ্রান্ত হইয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম, অমনি একমুহূর্তেই পূর্ণিমার চন্দ্রালোক চারিদিকের মুক্ত বাতায়ন দিয়া আমার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিল। আমার স্বহস্তজ্বালিত একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাতি এই আকাশপরিপ্লাবী অজস্র আলোককে আমার নিকট হইতে অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপরিমেয় জ্যোতিঃসম্পদ্

লাভ করিবার জন্য আমাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই, কেবল সেই বাতিটি এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে কী পাইলাম! বাতির মতো কোনো নাড়িবার জিনিস পাই নাই, সিন্দুকে ভরিবার জিনিস পাই নাই— পাইয়াছিলাম আলোক, আনন্দ, সৌন্দর্য, শান্তি। যাহাকে সরাইয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক বেশি পাইয়াছিলাম— অথচ উভয়কে পাইবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মকে পাইবার জন্য সোনা পাইবার মতো চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মতো চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধবিদ্বেষ-বাধাবিপত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, আর আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিলে সমস্ত সহজ সরল হইয়া যায়। আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

ভারতবর্ষে এই উদ্‌বোধনের যে মন্ত্র আছে তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা এক নিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়। তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ — গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতিশব্দের অর্থ— চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়; মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী— আমি কোনো বিশেষপ্রদেশবাসী নহি, আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি লোকলোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন— স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধ গৃহ ছাড়িয়া প্রত্যুষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া

আসেন, সেইরূপ আর্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্যজ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন,

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি।

এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি বিপুল বিশ্বজগৎ এক-সঙ্গে এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ-ভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি, সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই ধীশক্তি-দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার

ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী এ দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।

ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই-যে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি ইহা যেমন উদার তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না— ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগৎকে এবং এই বুদ্ধিকে তাঁহার অশ্রান্ত শক্তি-দ্বারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন, এই কথা স্মরণ করিলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেমন গভীরভাবে সমগ্রভাবে একান্তভাবে হৃদয়ংগম হয়, এমন আর কোন্ কৌশলে, কোন্ আয়োজনে, কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্ণতা নাই।

আমাদের এই ব্রহ্মের ধ্যান যেরূপ সরল অথচ বিরাট, আমাদের উপনিষদের প্রার্থনাটিও ঠিক সেইরূপ।

বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয় ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়। বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ

ছিল— তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। মাতাকে যদি কেবলই উপদেশ দিতে হয় যে, তুমি ছেলের কাছে অনবধান হইয়ো না, তোমাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অন্ত থাকে না— কিন্তু যদি বলি তুমি ছেলেকে ভালোবাসো, তবে দ্বিতীয় কোনো কথাই বলিতে হয় না, সমস্ত সরল হইয়া আসে। ফলত সেই ভালোবাসা ব্যতিরেকে মাতার কর্ম সম্ভবপর হইতেই পারে না। তেমনি যদি বলি, অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ হউক, তবে পাপসম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক হইতে যদি দেখি তবে জটিলতার অন্ত নাই— তাহা ছেদন করিয়া, দাহন করিয়া, নির্মূল করিয়া, কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না— সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ধর্মকে বিরাট বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়— কিন্তু আনন্দময়ের দিক হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ পাপ কুহেলিকার মতো অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া, দুর্গম করিয়া ধর্মকে দুর্বল করিয়াছে।—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

অসৎ হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

১

আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব— আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ পাপ নিরানন্দ কেবল এইজন্যই। সত্যের, জ্যোতির, অমৃতের ঐশ্বর্য যিনি কিছু পাইয়াছেন তিনিই জানেন, ইহাতে আমাদের জীবনের সমস্ত অভাবের একেবারে মূলচ্ছেদ

করিয়া দেয়। যে-সকল ব্যাঘাতে তাঁহার প্রকাশকে আমাদের নিকট হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহাই বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নানা দুঃখ এবং অকৃতার্থতার মধ্যে অবতীর্ণ করিয়া দেয়। সেইজন্যই আমাদের মন অসত্য অন্ধকার ও বিনাশের আবরণ হইতে রক্ষা চাহে। যখন সে বলে 'আমার দুঃখ দূর করো' তখন সে শেষ পর্যন্ত না বুঝিলেও এই কথাই বলে ; যখন সে বলে 'আমার দৈন্য মোচন করো' তখন সে যথার্থ কী চাহিতেছে তাহা না জানিলেও এই কথাই বলে। যখন সে বলে 'আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করো' তখনও এই কথা। সে না বুঝিয়াও বলে,

আবিরাবীর্ম এধি।

হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তর-বাহিরকে যেমন বিশ্বেশ্বরের দ্বারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব যে, যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি তাহাকে সচেতনভাবে জানিবার যাহা-কিছু বাধা সেই অসত্য, সেই অন্ধকার, সেই মৃত্যু যেন দূর হইয়া যায়। যাহা নাই তাহা চাই না, আমাদের যাহা আছে তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয় ; যাহা দূরে তাহাকে সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে স্বরচিত কল্পনাকুহকের স্পর্শ নাই।

জীবনযাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী। ভারতবর্ষ বলে,

সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন।

সুখ যিনি চান তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করিবেন, সন্তোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে; তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান। উপকরণসঞ্চয়ের আদি-অন্ত নাই; বাসনাবহ্নিতে যত আহুতি দেওয়া যায় সমস্ত ভস্ম হইয়া ক্ষুধিত শিখা ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমেই সে নিজের অধিকার হইতে পরের অধিকারে যায়, তাহার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দারুণ ভাব ধারণ করে। সুখকে বাহিরে কল্পনা করিয়া বিশ্বকে মৃগয়ার মৃগের মতো নিষ্ঠুর বেগে তাড়না করিয়া ফিরিলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারির উদ্দাম অশ্ব তাহাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

এইরূপ উন্মত্তভাবে যখন আমরা ছুটিতে থাকি তখন আমাদের আগ্রহের অসহ্য বেগে সমস্ত জগৎ অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমাদের চারি দিকে পদে পদে যে-সকল অযাচিত আনন্দ প্রভূত প্রাচুর্যের সহিত অহরহ প্রতীক্ষা করিয়া আছে তাহাদিগকে অনায়াসেই আমরা লঙ্ঘন করিয়া, দলন করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাই। জগতের অক্ষয় আনন্দের ভাণ্ডারকে আমরা কেবল ছুটিতে ছুটিতেই দেখিতে পাই না। এইজন্যই ভারতবর্ষ বলিতেছেন,

সংযতো ভবেৎ।

প্রবৃত্তিবেগ সংযত করো।

চাঞ্চল্য দূর হইলেই সন্তোষের স্তব্ধতার মধ্যে জগতের সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুলি আপনি প্রকাশিত হইবে। গতিবেগের প্রমত্ততাবশতই

আমরা সংসারের যে-সকল স্নেহ প্রেম সৌন্দর্যকে, প্রতিদিনের শত শত মঙ্গলভাবের আদানপ্রদানকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই, সংযত হইয়া স্থির হইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাদের ভিতরকার সমস্ত ঐশ্বর্য অতি সহজেই অবারিত হইয়া যায়।

যাহা নাই তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না; ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, এ কথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে বাহিরে চারি দিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়; কারণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে অন্তরেই লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা; আমরা যে অমৃত-লোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের প্রার্থনা; চিত্তসরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা। কিছু কল্পনা করা নহে, রচনা করা নহে, আহরণ করা নহে— জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া— যাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত সরল হওয়া। যাহা সত্য তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের নিকটতম, সত্য বলিয়াই তাহা দিবালোকের ন্যায় আমাদের সকলেরই প্রাপ্য, তাহা আমাদের স্বরচিত নহে বলিয়াই তাহা আমাদের পক্ষে সুগম, তাহা আমাদের সম্যক্‌-ধারণার অতীত বলিয়াই তাহা আমাদের চিরজীবনের আশ্রয়— তাহার প্রতিনিধিমাত্রই তাহা অপেক্ষা সুদূর — তাহাকে আমাদের কোনো আবশ্যকবিশেষের উপযোগিরূপে, বিশেষ আয়ত্তগম্যরূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে গেলেই তাহাকে কঠিন করা হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করা হয়; অধীর হইয়া তাহাকে বাহ্যাড়ম্বরের

মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইলে নিজের সৃষ্টিকেই খুঁজিয়া ফিরিতে হয়; এইরূপে চেষ্টার উপস্থিত উত্তেজনামাত্র লাভ করি, কিন্তু চরম সার্থকতা প্রাপ্ত হই না। আজ আমরা ভারতবর্ষের সেই উপদেশ ভুলিয়াছি, তাহার অকলঙ্ক সরলতম বিরাটতম একনিষ্ঠ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শতধাবিভক্ত খর্বতা-খণ্ডতার দুর্গম গহনমধ্যে মায়ামৃগীর অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছি।

হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল করো। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবিবর্জিত তোমারই পথ; আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, চারি দিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘরশব্দে চারি দিকে ধাবিত হইয়াছে, স্বার্থের ঝঞ্চাবায়ু প্রলয়-গর্জনে চারি দিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে— হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে; হে শান্তংশিবমদ্বৈতম্‌, এই ঝঞ্চাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক মৃত

পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্‌বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না, আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয়তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে,

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে— তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনও ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল— সকলের ঊর্ধ্বে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জনের মধ্যে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল,

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—

একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না—

ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহুশতাব্দী হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে— ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে— দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাঘ ১৩০৯

প্রাচীন ভারতের একঃ

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে, সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে।

এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

হে সৌম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসবৃক্ষে আসিয়া স্থির হয়, তেমনি এই যাহা-কিছু সমস্তই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নদী যেমন নানা বক্রপথে সরলপথে, নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা নির্ঝরধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধাবিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়— মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর-একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যু-বিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া, অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বজ্র-মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছিল?

এমন সময়ে সেই অন্তবিহীন পথপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ দিশাহারা পথিক শুনিতে পাইল, পথের প্রান্তে ছায়ানিবিড় তপোবনে গম্ভীর মন্ত্রে এই বার্তা উদ্‌গীত হইতেছে,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে, সেই পরিপূর্ণে এ-সমস্তই পূর্ণ।

সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কষ্ট দূর হইয়া গেল। তখন অন্তহীন কার্যকারণের ক্লান্তিকর শাখাপ্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বলিল,

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।

বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একধাই দেখিতে হইবে।

সহস্র বিভীষিকা ও বিস্ময়ের মধ্যে দেবতা-সন্ধানশ্রান্ত ভক্তি তখন বলিল—

এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবের পালনকর্তা— এই একই সেতুস্বরূপ হইয়া সকল লোককে ধারণ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন।

বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্ট বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল,

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সেই যে এক, তিনি সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য-সকল হইতেই প্রিয়।

মুহূর্তেই বিশ্বের বহুত্ববিরোধের মধ্যে একের ধ্রুব শান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল— একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল।

শিশিরনিষিক্ত শীতের প্রত্যুষে পূর্ব দিক যখন অরুণবর্ণ, লঘুবাষ্পাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসন্ন জাগরণের একটি অখণ্ড শান্তি বিরাজমান— যখন মনে হয়, যেন জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, এখনও সেই বিশ্বগেহিনী তাঁহার বিপুল

গৃহের অসংখ্য জীবপালনকার্য আরম্ভ করেন নাই, তিনি যেন দিবসারম্ভে ওঙ্কারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্মন্দিরের উদ্‌ঘাটিত স্বর্ণতোরণদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন— তখন যদি চিন্তা করিয়া দেখি তবে প্রতীতি হইবে, সেই নির্জন নিঃশব্দ নীহারমণ্ডিত প্রান্তরের মধ্যে প্রয়াসের অন্ত নাই। প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র চেষ্টা নিরন্তর, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজনবিযোজন-আকর্ষণবিকর্ষণের কার্য বিশ্রামবিহীন। অথচ এই অশ্রান্ত অপরিমেয় কর্মব্যাপারের মধ্যে শান্তিসৌন্দর্য অচল হইয়া আছে। অদ্য এই মুহূর্তে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে যে প্রচণ্ড শক্তি প্রবল বেগে শূন্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে সে শক্তি আমাদের কাছে কথাটি মাত্র কহিতেছে না, শব্দটি মাত্র করিতেছে না। অদ্য এই মুহূর্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাসমুদ্রে যে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ সগর্জন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, শতসহস্র নদনদীনির্ঝরে যে কল্লোল উঠিতেছে, অরণ্যে অরণ্যে যে আন্দোলন, পল্লবে পল্লবে যে মর্মরধ্বনি, আমরা তাহার কী জানিতেছি? বিশ্বব্যাপী যে মহাকর্মশালায় দিবারাত্রি লক্ষকোটি জ্যোতিষ্কদীপের নির্বাণ নাই তাহার অনন্ত কলরব কাহাকে বধির করিয়াছে, তাহার প্রচণ্ড প্রয়াসের দৃশ্য কাহাকে পীড়িত করিতেছে? এই কর্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহদ্‌ভাবে দেখি তখন দেখি, তাহা চিরদিন অক্লান্ত, অক্লিষ্ট, প্রশান্ত, সুন্দর— এত কর্মে, এত চেষ্টায়, এত জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিন্তিত চিহ্নিত ভারাক্রান্ত হয় নাই। চিরদিনই তাহার প্রভাত কী সৌম্যসুন্দর, তাহার মধ্যাহ্ন কী শান্তগম্ভীর, তাহার সায়াহ্ন কী করুণকোমল, তাহার রাত্রি কী উদার-উদাসীন। এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি এবং সৌন্দর্য, এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সংগীত কী করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার এক উত্তর এই যে,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক।

সেইজন্যই বৈচিত্র্যেও সুন্দর এবং বিশ্বকর্মের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজমান।

গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারিদিককে কী নিভৃত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়। অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। এ কী অপরূপ আশ্চর্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা। কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতির্হীন মহাসূর্যমণ্ডল, কত অগণ্যযোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্পসংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি-উচ্ছ্বাস, তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে, একান্ত নির্জনে রহিয়াছি— শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই। এমন সম্ভব হইল কী করিয়া? ইহার কারণ,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কী ভয়ংকর। বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি এক সূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তিসকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত হইয়া না থাকে, তবে তাহা কী করাল, তবে বিশ্বসংসার কী অনির্বচনীয় বিভীষিকা। তবে আমরা দুর্ধর্ষ জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি? এই মহা-অপরিচিত যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মতো অনুভব করিতেছি। এই-যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আছি, ইহার মধ্যে সংযোজন-বিযোজনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে তাহা এই আসন হইতে

আরম্ভ করিয়া সূর্যলোক-নক্ষত্রলোক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-অখণ্ড-ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোকলোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত-পৃথক্‌কৃত করিতেছে; আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভয়ে আরামে বসিয়া আছি, তাহার ভীষণ সত্তাকে জানিতেও পারিতেছি না, সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা খেলিতেছি, গৃহনির্মাণ করিতেছি— এ আমাদের কে? ইহাকে প্রশ্ন করিলে এ কোনোই উত্তর দেয় না। ইহা দিকে দিকে আকাশ হইতে আকাশান্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া শতধা-সহস্রধা চলিয়া গেছে— এই মূক মূঢ় মহাবহুরূপীর সঙ্গে কে আমাদের এমন প্রিয়, পরিচিত আত্মীয় সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন? তিনি, যিনি

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

এই এককে আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তিস্বরূপে দেখিতেছি। তেমনি মানুষের সংসারের মধ্যে সেই স্তব্ধ একের ভাবটি কী? সেই ভাবটি মঙ্গল। এখানে আঘাত-প্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে সুখদুঃখ বিরহমিলন বিপৎসম্পদ্‌ লাভক্ষতিতে সংসারের সর্বত্র সর্বক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য, এই সংগ্রামের মধ্যে সেই এক নিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেইজন্যই নানা বিরোধবিদ্বেষের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যজাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে যতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি ততই তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। যেমন খণ্ডভাবে আমরা জগতের মধ্যে অসংখ্য কদর্যতা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত জগৎ মহাসৌন্দর্যে প্রকাশিত— তেমনি খণ্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিচ্ছিন্ন মঙ্গল-

সূত্রে চিরদিন ধৃত হইয়া আছে। ইহার অংশের মধ্যে কত অশান্তি, কত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবু দেখি ইহার সমগ্রের মঙ্গল-আদর্শ কিছুতে নষ্ট হয় না। সেইজন্য মানুষ সংসারকে এমন সহজে আশ্রয় করিয়া আছে। এত বৃহৎ লোকসংঘ, এত অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল স্বার্থসংঘাত, তবু এ সংসার রমণীয়; তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না। ইহার দুঃখতাপও মহামঙ্গলসংগীতের একতানে অপূর্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে, কেননা

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতি ক্ষণে খণ্ড খণ্ড করি বলিয়াই সংসার-তাপ দুঃসহ হয়। সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান একের মধ্যে গ্রথিত করিতে পারিলে, সমস্ত আক্ষেপবিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সমস্ত হৃদয়বৃত্তি, সমস্ত কর্মচেষ্টাকে তাঁহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে কোন্ বাধায় আমার অধীরতা, কোন্ বিঘ্নে আমার নৈরাশ্য, কোন্ লোকের কথায় আমার ক্ষোভ, কোন্ ক্ষমতায় আমার অহংকার, কোন্ বিফলতায় আমার গ্লানি! তাহা হইলেই আমার সকল কর্মের মধ্যেই ধৈর্য ও শান্তি, সকল হৃদ্বৃত্তির মধ্যেই সৌন্দর্য ও মঙ্গল উদ্ভাসিত হয়; দুঃখতাপ পুণ্যে বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাতবেদনা মাধুর্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তখন সর্বত্র সেই স্তব্ধ একের মঙ্গলবন্ধন অনুভব করিয়া সংসারে দুঃখের অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য করি না— দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে, অভাবের মধ্যে নতমস্তকে তাঁহাকেই স্বীকার করি যাঁহার মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে সমস্ত জগৎ-সংসারের সমস্ত দুঃখতাপের সমস্ত তাৎপর্য অখণ্ড মঙ্গলে পরিসমাপ্ত হইয়া আছে।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় যে ইঁহাকে নানা করিয়া দেখে।

খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে ; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে : খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে ; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই একক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধন-জন-মান বড়ো আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্বরথ ইষ্টককাষ্ঠ মর্যাদালাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহ-চেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিজেকে খণ্ডন করিতে থাকি— এবং মৃত্যু যখন আমাদের এই ভাণ্ডারদ্বার হইতে আমাদিগকে অকস্মাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় তখন সেই শেষ মুহূর্তে সমস্ত জীবনের বহুবিরোধের সঞ্চিত স্তূপাকার দ্রব্যসামগ্রীগুলাকেই প্রিয়তম বলিয়া, আত্মার পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া, অন্তিমবলে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মনের দ্বারাই ইহা পাওয়া যায় যে, ইঁহাতে 'নানা' কিছুই নাই।

বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন তিনি বাহ্যত এক-ভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন ; মনই নানার মধ্যে সেই একক দেখে, সেই একক প্রার্থনা করে, সেই একক আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই একক না পাইলে মনের সুখশান্তিমঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের অবসান নাই। সেই ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না, সে খণ্ডখণ্ড মৃত্যুদ্বারা আহত তাড়িত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিক ধর্ম-বশতই কখনো জানিয়া কখনো না-জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরলপথে, সকল

জ্ঞানের মধ্যে, সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায় তখন এক মুহূর্তেই বলিয়া উঠে, আমি অমৃতকে পাইয়াছি; বলিয়া উঠে,

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অন্ধকারের পারে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ-সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন,

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।
যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব তাহা লইয়া আমি কী করিব!

যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়, কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই এককে আশ্রয় করিয়াছেন তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন; তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ

করিতেছেন ; বিপৎসম্পদ্‌ মুহূর্তে মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে কিন্তু

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ,
এষোঽস্য পরমো লোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

সেই এক রহিয়াছেন— যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ।

রেশম পশম আসন-বসন কাষ্ঠ-লোষ্ট্র স্বর্ণ-রৌপ্য লইয়া কে বিরোধ করিবে। তাহারা আমার কে ? তাহারা আমাকে কী দিতে পারে ? তাহারা আমার পরমসম্পৎকে অন্তরাল করিতেছে, তাহাতে দিবারাত্রির মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অনুভব করিতেছি না, কেবল তাহাদের পুঞ্জীকৃত সঞ্চয়ে গর্ববোধ করিতেছি। হস্তি-অশ্ব-কাচ-প্রস্তরেরই গৌরব, আত্মার গৌরব নাই— শূন্য হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের স্থান নাই। সর্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত, শ্রীহীন, মলিন ; কেবল বসনে-ভূষণে উপকরণে-আয়োজনে আমি স্ফীত। জগদীশ্বরের কাজ করিতে পারি না ; কেননা শয্যা-আসন-বেশভূষার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, জড়-উপকরণ-জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া বসিয়াছি— সেই-সকল ধূলিময় পদার্থের ধুলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়। ঈশ্বরের কাজে আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, কারণ খট্টাপর্যঙ্ক-অশ্বরথে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত। সমস্ত মঙ্গলকর্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচজনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান। শতছিদ্র কলসের মধ্যে জলসঞ্চয় করিবার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছি, অবারিত অমৃতপারাবার সম্মুখে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে ; যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানে-ধর্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না— এত বড়ো অন্ধতা লইয়া আমি পরিতৃপ্ত। যিনি আনন্দরূপমমৃতম্‌, যে আনন্দের কণামাত্র আনন্দে সমস্ত জীবজন্তুর প্রাণের চেষ্টা, মনের

চেষ্টা, প্রীতির চেষ্টা, পুণ্যের চেষ্টা উৎসাহিত রহিয়াছে— তাঁহাতে আমার আনন্দ নাই ; আমার আনন্দ, আমার গর্ব কেবল উপকরণ-সামগ্রীতে— এমন বৃহৎ জড়ত্বে আমি পরিবৃত। যাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলিনির্দেশে জীব-প্রকৃতি অজ্ঞাত অকীর্তিত সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া স্বার্থ হইতে পরমার্থে, স্বেচ্ছাচার হইতে সংযমে, এককতা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্‌, যিনি দগ্ধেন্ধনইবানলঃ, সর্বকালে সর্বলোকে যিনি আমার ঈশ্বর, তাঁহার আদেশবাক্য আমার কর্ণগোচর হয় না ; তাঁহার কর্মে আমার কোনো আস্থা নাই ; কেবল জীবনের কয়েকদিনমাত্র যে-কয়েকটি লোককে পাঁচজন বলিয়া জানি তাহাদেরই ভয়ে এবং তাহাদেরই চাটুবাক্যে চালিত হওয়াই আমার দুর্লভ মানব-জন্মের একমাত্র লক্ষ্য—এমন মহামূঢ়তার দ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন। আমি জানি না, আমি দেখিতে পাই না,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্‌।

আমার কাছে সমস্ত জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সমস্ত বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমস্ত জীবনের লক্ষ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র অংশে বিভক্ত বিদীর্ণ।

হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম এক পরমাত্মন্‌, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ করো। তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহে-মনে, অন্তরে-বাহিরে, জ্ঞানে কর্মে-ভাবে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে তোমার দ্বারা আবৃত রাখিয়া নীরবে নিরভিমানে তোমার কর্ম করিতে চাই। অহরহ তুমি আদেশ করো, তুমি আহ্বান করো, তোমার প্রসন্নদৃষ্টিদ্বারা আমাকে আনন্দ দাও, তোমার দক্ষিণবাহুদ্বারা আমাকে বল দান করো। অবসাদের দুর্দিন যখন আসিবে, বন্ধুরা যখন নিরস্ত হইবে, লোকেরা যখন লাঞ্ছনা করিবে,

আনুকূল্য যখন দুর্লভ হইবে, তুমি আমাকে পরাস্ত ভূলুণ্ঠিত হইতে দিয়ো না; আমাকে সহস্রের মুখাপেক্ষী করিয়ো না; আমাকে সহস্রের ভয়ে ভীত, সহস্রের বাক্যে বিচলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতে যেন না হয়। এক তুমি আমার চিত্তের একাসনে অধীশ্বর হও, আমার সমস্ত কর্মকে একাকী অধিকার করো, আমার সমস্ত অভিমানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে তোমার পদপ্রান্তে একত্রে সংযত করিয়া রাখো। হে অক্ষরপুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয়, ব্রহ্মের আনন্দ যে কী তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে আর-একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই— কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার উর্ধ্বে থাকে, তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিষ্মৎ হইয়া উঠে। আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শানিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি

সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই-সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনোই অমর হইবে না— তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা ধনমত্ততা, সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে। হে অদ্বিতীয় এক, তপস্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বল্কলবসন পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই মধুরকণ্ঠে বলিতে পারে,

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।

যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব!

কামান-ধূম্র এবং স্বর্ণধূলির দ্বারা সমাচ্ছন্ন তমসাবৃত রাষ্ট্রগৌরবের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ো না; তোমার সেই অনন্ধকার লোকের প্রতি দীন ভারতের নতশির উত্থিত করো।

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

যখন তোমার সেই অনন্ধকার আবির্ভূত হয় তখন কোথায় দিবা, কোথায় রাত্রি, কোথায় সৎ, কোথায় অসৎ।

শিব এব কেবলঃ, তখন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,

নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ,

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

হে শম্ভব, হে ময়োভব, তোমাকে নমস্কার; হে শংকর, হে ময়স্কর, তোমাকে নমস্কার; হে শিব, হে শিবতর, তোমাকে নমস্কার।

ফাল্গুন ১৩০৮

প্রার্থনা

সকলেই জানেন একটা গল্প আছে— দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এত বড়ো সুযোগটাতে হতভাগ্য কী যে চাহিবে ভাবিয়া বিহ্বল হইল; শেষকালে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে যে-তিনটে প্রার্থনা জানাইল তাহা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার পরে চিরজীবন অনুতাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

এই গল্পের তাৎপর্য এই যে, আমরা মনে করি, পৃথিবীতে আর কিছু জানি বা না-জানি, ইচ্ছাটাই বুঝি আমাদের কাছে সব চেয়ে জাজ্বল্যমান, আমি সব চেয়ে কী চাই তাহাই বুঝি সব চেয়ে আমার কাছে সুস্পষ্ট — কিন্তু সেটা ভ্রম। আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।

অগোচরে থাকিবার একটা কারণ আছে— সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। যে বিরাট ইচ্ছা সমস্ত মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে উদ্‌যোগী সেই ইচ্ছাই আমার অন্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে সর্বাংশে তাহার অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারি। তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদিগকে ধরা দেয় না।

আমার সব চেয়ে সত্য ইচ্ছা, নিত্য ইচ্ছা কোন্‌টা? যে ইচ্ছা আমার সার্থকতাসাধনে নিরত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্যন্ত রহস্য সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয়; কিন্তু 'কিসে

আমি সম্পূর্ণ হইব' তাহা পৃথিবীতে কয়জন লোক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? আমি কী, আমার মধ্যে যে-একটা প্রকাশচেষ্টা চলিতেছে তাহার পরিণাম কী, তাহার গতি কোন্‌ দিকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কে জানে?

অতএব দেবতা যদি বর দিতে আসেন তবে হঠাৎ দেখি, প্রার্থনা জানাইবার জন্যও প্রস্তুত নই। তখন এই কথা বলিতে হয়, আমার যথার্থ প্রার্থনা কী তাহা জানিবার জন্য আমাকে সুদীর্ঘ সময় দাও। নহিলে উপস্থিতমতো হঠাৎ একটা-কিছু চাহিতে গিয়া হয়তো ভয়ানক ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় লইয়াছি, আমাদের জীবনটা এই কাজেই আছে। আমরা কী প্রার্থনা করিব তাহাই অহরহ পরখ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান— এমনি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করিতেছি, আলোড়ন করিতেছি। কিসের জন্য? আমি যথার্থ কী চাই তাহারই সন্ধান পাইবার জন্য। মনে করিতেছি— টাকা খুঁজিতেছি, বন্ধু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি; কিন্তু আসলে আর-কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি তাহাই নানা স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; আমার প্রার্থনা কী তাহাই জানি না।

যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন, শোনা গিয়াছে তাঁহারা কী বলেন। তাঁহারা বলেন; একটিমাত্র প্রার্থনা আছে তাহা এই,

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করো।

কিন্তু কানে শুনিয়া কোনো ফল নাই এবং মুখে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া আরও বৃথা। আমরা যখন সত্যকে আলোককে অমৃতকে যথার্থ চাহিব, সমস্ত জীবনে তাহার পরিচয় দিব, তখনই এ প্রার্থনা সার্থক হইবে। যে প্রার্থনা আমি নিজে মনের মধ্যে পাই নাই তাহা পূর্ণ হইবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নাই। অতএব, সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হইল, কিন্তু তবু এখনও প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়া খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে নিগূঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে, কিন্তু যতক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আকাশে আলোকে মাথা না তুলিয়াছে ততক্ষণ তাহা না-থাকারই তুল্য হইয়া আছে। সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাহাকে জানিই না যতক্ষণ না সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে পাতা মেলিতে পারে।

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাটি কী তাহা অনেক সময় অন্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে জানিতে হয়। জগতের মহাপুরুষেরা আমাদিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি, আমরা বুঝি পেট ভরাইতেই চাই, আরাম করিতেই চাই; কিন্তু যখন দেখি কেহ ধন-মান-আরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য আলোক ও অমৃতের জন্য জীবন উৎসর্গ

করিতেছেন, তখন হঠাৎ একরকম করিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমার ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যও জানিতে পারি, কিসের প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি, কী আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।

তখন আরও একটা কথা বোঝা যায়। ইহা বুঝিতে পারি যে, যে-সমস্ত ইচ্ছা প্রতি ক্ষণে আমার সুগোচর, যাহারা কেবলই আমাকে তাড়না করে, তাহারাই আমার অন্তরতম ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতা-লাভের প্রার্থনাকে বাধা দিতেছে, স্ফূর্তি দিতেছে না; তাহাকে কেবলই আমার চেতনার অন্তরালবর্তী, আমার চেষ্টার বহির্গত করিয়া রাখিয়াছে।

আর, যাঁহার কথা বলিতেছি তাঁহার পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। যে মঙ্গল-ইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মজ্জাস্বরূপ, যাহা মানবসমাজের মধ্যে চিরদিনই অকথিত বাণীতে এই মন্ত্র গান করিতেছে — অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়— এই ইচ্ছাই তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ; আর-সমস্ত ইচ্ছা ছায়ার মতো তাহার পশ্চাদ্‌বর্তী, তাহার পদতলগত। তিনি জানেন— সত্য, আলোক, অমৃতই চাই; মানুষের ইহা না হইলেই নয়। অন্নবস্ত্র-ধনমানকে তিনি ক্ষণিক ও আংশিক আবশ্যক বলিয়াই জানেন। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া জগতে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, প্রমাণিত হয় বলিয়াই তিনি চিরকালের জন্য মানবের সামগ্রী হইয়া উঠেন। আর আমরা খাই পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই— মানবের চিরন্তন সত্য-ইচ্ছাকে আমাদের যে জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারি না, মানবসমাজে সে জীবনের ক্ষণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনিলে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হইতে পারে যে, ক্ষমতাসাধ্য প্রতিভাসাধ্য কর্মের দ্বারাতেই বুঝি মানুষ সত্য আলোক ও অমৃতানুসন্ধানের পরিচয় দেয়।

তাহা কোনোমতেই নহে। তাহা যদি হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশামাত্র করিতে পারিত না। যাহা সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহুবলের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন; কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা কেবল একান্তভাবে যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম। ইহা আর কিছু নয়— যাহা কাছেই আছে তাহাকেই পাওয়া।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে যাহা-কিছু দিবার তাহা আমাদের প্রার্থনার বহু পূর্বেই দেওয়া হইয়া গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিতধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা— তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।

ঈশ্বর এইখানেই আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই সব দিয়াছেন, অথচ এটুকু আমাদের বলিবার মুখ রাখিয়াছেন যে, আমরাই লইয়াছি। এই লওয়াটাই সফলতা, ইহাই লাভ; পাওয়াটা সকল সময়ে লাভ নহে— তাহা অধিকাংশ স্থলেই পাইয়াও না-পাওয়া, এবং অবশিষ্ট স্থলে বিষম একটা বোঝা। আর্থিক-পারমার্থিক সকল বিষয়েই এ কথা খাটে।

ঋষি বলিয়াছেন,

আবিরাবীর্ম এধি। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

তুমি তো স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন আমার কাছে প্রকাশিত হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই, আমার পক্ষে সেই প্রকাশ-উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে।

যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণপ্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না। সূর্য তো আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন; এখন আমারই কেবল চোখ খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ খুলিবার ইচ্ছা হয়, আমরা চোখ খুলি; তখন সূর্য আমাদিগকে নূতন করিয়া কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে আপনি দান করিয়া রাখিয়াছেন ইহাই আমরা মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতে পারি।

অতএব দেখা যাইতেছে— আমরা যে কী চাই তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারাই প্রার্থনার আরম্ভ। যখন তাহা জানিতে পারিলাম তখন সিদ্ধির আর বড়ো বিলম্ব থাকে না, তখন দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে— এই সুমহৎ আকাঙ্ক্ষাই আপনার মধ্যে আপনার সফলতা অতি সুন্দরভাবে, অতি সহজভাবে বহন করিয়া আনে।

আমাদের ছোটো বড়ো সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড়ো ইচ্ছা, এই মর্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে খর্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

এ-যে কেবল আমাদের খাওয়া-পরা, আমাদের ধনমান-অর্জন সম্বন্ধেই খাটে তাহা নহে— আমাদের বড়ো বড়ো চেষ্টা-সম্বন্ধে আরও বেশি করিয়াই খাটে।

যেমন দেশহিতৈষা। এ প্রবৃত্তি যদিও আমাদিগকে আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। ইহার প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই, আমাদের

নিকটেই রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য, পরম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে আলোককে অমৃতকে য়ুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে, সার্থকতা লাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপ কেবলই মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে— এমন লোলুপভাবে, এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে, সত্য আলোক ও অমৃতের জন্য মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ— পথ নহে— ইহাই মৃত্যু।

আমাদের সম্মুখে, আমাদের অত্যন্ত নিকটে য়ুরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রতিদিন মোহাভিভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য-আলোক-অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী— বিষয়ানুরাগই হউক আর দেশানুরাগই হউক, আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ে যেখানেই এই সত্য আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে সেখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে হইবে— বিনিপাত! বলা কঠিন, প্রলোভন প্রবল, ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য, তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,

> অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

আষাঢ় ১৩১১

ধর্মপ্রচার

'এস আমরা ফললাভ করি' বলিয়া হঠাৎ উৎসাহে তখনই পথে বাহির হইয়া পড়াই যে ফললাভের উপায়, তাহা কেহই বলিবেন না। কারণ কেবলমাত্র সদিচ্ছা এবং সদুৎসাহের বলে ফল সৃষ্টি করা যায় না। বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে। দলবদ্ধ উৎসাহের দ্বারাতেও সে নিয়মের অন্যথা ঘটিতে পারে না। বীজ ও বৃক্ষের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া আমরা যদি অন্য উপায়ে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করি তবে সেই ঘরগড়া কৃত্রিম ফল খেলার পক্ষে, গৃহসজ্জার পক্ষে অতি উত্তম হইতে পারে— কিন্তু তাহা আমাদের যথার্থ ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক ধর্মসমাজে আমরা এই কথাটা ভাবি না। আমরা মনে করি, দল বাঁধিলেই বুঝি ফল পাওয়া যায়। শেষকালে মনে করি দল বাঁধাটাই ফল।

ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উৎসাহ হয়, প্রচার করিতে হইবে। হঠাৎ অনুতাপ হয়, কিছু করিতেছি না। যেন করাটাই সব চেয়ে প্রধান— কী করিব, কে করিবে, সেটা বড়ো-একটা ভাবিবার কথা নয়।

কিন্তু এ কথাটা সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে, ধর্মপ্রচারকার্যে ধর্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই তবে ধর্মরক্ষা হইবে তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।

মনুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা পুরানতম। এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ। জগতের চিরন্তন ধর্মগুরুগণ কোনো নূতন

সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা পুরাতনকে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে নূতন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাহাকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন।

নব নব বসন্ত নব নব পুষ্প সৃষ্টি করে না— সেরূপ নূতনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পুরাতন ফুলগুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। সংসারের যাহা-কিছু মহোত্তম, যাহা মহার্ঘতম, তাহা পুরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই; যাঁহাদের অভ্যুদয় বসন্তের ন্যায় অনির্বচনীয় জীবন ও যৌবনের দক্ষিণসমীরণ মহাসমুদ্রবক্ষ হইতে সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা সহসা এই পুরাতনকে অপূর্ব করিয়া তোলেন, অতিপরিচিতকে নিজ জীবনের নব নব বর্ণে গন্ধে রূপে সজীব সরস প্রস্ফুটিত করিয়া মধুপিপাসুগণকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।

আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্ত বাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা তাহাদিগকে একটা নিয়ম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইতে গেলে, হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

বিপদ কেবল এই একমাত্র নহে। অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাষাবিন্যাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি, কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহনমাত্র।

এইরূপে ধর্মও যখন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে, হয় অভ্যস্ত অসাড়তায় নয় অভ্যস্ত

সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্মকে নূতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই সূত্রে তাহাকে পুনর্বার বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের, বিশেষ স্থানের, বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া উঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে চেষ্টা করে না, ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গণ্ডিরক্ষাকেই তাহারা ধর্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। বিজ্ঞানের কোনো নূতন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহারা প্রথমে ইহাই দেখে যে, সে তত্ত্ব তাহাদের গণ্ডির সীমানায় হস্তক্ষেপ করিতেছে কি না ; যদি করে তবে 'ধর্ম গেল' বলিয়া তাহারা ভীত হইয়া উঠে। ধর্মের বৃন্তটিকে তাহারা এতই ক্ষীণ করিয়া রাখে যে, প্রত্যেক বায়ুহিল্লোলকে তাহারা শত্রুপক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে। ধর্মকে তাহারা সংসার হইতে বহু দূরে স্থাপিত করে— পাছে ধর্ম-সীমানার মধ্যে মানুষ আপন হাস্য, আপন ক্রন্দন, আপন প্রাত্যহিক ব্যাপারকে, আপন জীবনের অধিকাংশকে লইয়া উপস্থিত হয়। সপ্তাহের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়— বাকি সমস্ত দেশকালের সহিত ইহার একটি পার্থক্য, এমন কি, ইহার একটি বিরোধ ক্রমশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রহ্মের, এক সম্প্রদায়ের সহিত

অন্য সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও বিদ্রোহভাব স্থাপন করাই, মনুষ্যত্বের মাঝখানে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করাই যেন ধর্মের বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

অথচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না— সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত— তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোটো-বড়ো অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি গির্জার গণ্ডির মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়া অন্য যে-কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শ-দ্বারা সংসারের ব্যবহার চালাইতে যাই, তাহাতে সর্বনাশী অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে— তাহা পলিটিক্‌স্ হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম-আমোদ হইতে, কাব্য-কলা হইতে, জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজনসাধনের জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য। এইরূপে ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষে যাহা অধর্ম তাহাই অনুপযোগী ছিল; ধর্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্য সফলতা-দ্বারা ধর্মের বিচার চলিত না।

এইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত, ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্বলাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থতনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য। সকল কর্ম সকল আশ্রমের সাহায্যেই ব্রহ্ম-উপলব্ধি যখন ভারতবর্ষের চরম সাধনা, তখন ব্রহ্মচর্যই তাহার শিক্ষা না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে যাহা যথার্থভাবে চায় সে তাহার উপায় সেইরূপ যথার্থভাবে অবলম্বন করে। য়ুরোপ যাহা কামনা করে, বাল্যকাল হইতে তাহার পথ সে প্রস্তুত করে; তাহার সমাজে, তাহার প্রাত্যহিক জীবনে সেই লক্ষ্য জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সে ধরিয়া রাখে। এই কারণেই য়ুরোপ দেশ জয় করে, ঐশ্বর্য লাভ করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের সেবাকার্যে নিযুক্ত করিয়া আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। তাহার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই সে সিদ্ধকাম হইয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয়েরা বলিয়া থাকে, তাহাদের পাবলিক-স্কুলে, তাহাদের ক্রিকেটক্ষেত্রে, তাহারা রণজয়ের চর্চা করিয়া লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এক কালে আমরা সেইরূপ যথার্থভাবেই ব্রহ্মলাভকে যখন চরম লাভ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম তখন সমাজের সর্বত্রই তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তখন য়ুরোপীয় রিলিজন-চর্চার আদর্শকে আমাদের দেশ কখনোই ধর্মলাভের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং ধর্মপালন তখন সংকুচিত হইয়া বিশেষভাবে রবিবার বা আর-কোনো বারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। ব্রহ্মচর্য তাহার শিক্ষা ছিল, গৃহাশ্রম তাহার সাধনা ছিল, সমস্ত সমাজ তাহার অনুকূল ছিল এবং যে ঋষিরা লব্ধকাম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন,

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—

যাঁহারা বলিয়াছিলেন,

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—

তাঁহারাই তাহার গুরু ছিলেন।

ধর্মকে যে আমরা শৌখিনের ধর্ম করিয়া তুলিব; আমরা যে মনে করিব, অজস্র ভোগবিলাসের এক পার্শ্বে ধর্মকেও একটুখানি স্থান দেওয়া আবশ্যক, নতুবা ভব্যতারক্ষা হয় না, নতুবা ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবনে যেটুকু ধর্মের সংস্রব রাখা শোভন, তাহা রাখিবার উপায় থাকে না; আমরা যে মনে করিব, আমাদের আদর্শভূত পাশ্চাত্যসমাজে ভদ্র-পরিবারেরা ধর্মকে যেটুকু পরিমাণে স্বীকার করা ভদ্রতারক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন আমরাও সর্ববিষয়ে তাঁহাদের অনুবর্তন করিয়া অগত্যা সেইটুকু পরিমাণ ধর্মের ব্যবস্থা না রাখিলে লজ্জার কারণ হইবে; তবে আমাদের সেই ভদ্রতাবিলাসের আসবাবের সঙ্গে ভারতের সুমহৎ ব্রহ্মনামকে জড়িত করিয়া রাখিলে আমাদের পিতামহদের পবিত্রতম সাধনাকে চটুলতম পরিহাসে পরিণত করা হইবে।

যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই ঋষিরা কী বলিয়াছিলেন? তাঁহারা বলেন,

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

বিশ্বজগতে যাহা-কিছু চলিতেছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে, অন্যের ধনে লোভ করিবে না।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী' এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যন্ত

বৃহৎ— সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্— ইহা কাজের কথা; ইহা কাল্পনিক কিছু নহে, ইহা কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণদ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

ঋষিরা যে ব্রহ্মকে কতখানি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের একটি কথাতেই বুঝিতে পারি। তাঁহারা বলিয়াছেন,

তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

এই যে ব্রহ্মলোক, অর্থাৎ যে ব্রহ্মলোক সর্বত্রই রহিয়াছে, ইহা তাঁহাদেরই, তপস্যা যাঁহাদের, ব্রহ্মচর্য যাঁহাদের, সত্য যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ যাঁহারা যথার্থভাবে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে চেষ্টা করেন, যথার্থ উপায় অবলম্বন করেন। তপস্যা একটা-কোনো কৌশলবিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপন রহস্য নহে—

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং
তপো যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃসুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতৎ তপঃ।

ঋতই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, কর্ম তপস্যা এবং ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকব্যাপী এই-যে ব্রহ্ম ইঁহার উপাসনাই তপস্যা।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বল তেজ শান্তি সন্তোষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কর্ম দ্বারা স্বার্থপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, তবে অন্তরে-বাহিরে আত্মায়-পরে লোক-লোকান্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

উপনিষদ্ বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি সর্বমেবাবিবেশ, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি। আমরা ধৈর্যলাভ করিলাম কি না, অভয়লাভ করিলাম কি না, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হইল কি না, আত্মবিস্মৃত মঙ্গলভাব আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল কি না, পরনিন্দা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় ও পরের প্রতি ঈর্ষার উদ্রেক আমাদের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয় হইল কি না, বৈষয়িকতার বন্ধন, ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের প্রলোভন-পাশ ক্রমশ শিথিল হইতেছে কি না, এবং সর্বাপেক্ষা যাহাকে বশ করা দুরূহ সেই উদ্যত আত্মাভিমান বংশীরববিমুগ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আপন মস্তক নত করিতেছে কি না, ইহাই অনুধাবন করিলে আমরা যথার্থভাবে দেখিব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, ব্রহ্মের দ্বারা নিখিলজগৎকে কত দূর পর্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখিয়াছি।

আমরা বিশ্বের অন্য সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না, তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিরকালসঞ্চিত প্রাণ বুদ্ধি প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে

আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়— কারণ মানবসমাজের উত্তরোত্তর-বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিতে পারা আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম সেই কর্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, কর্মবৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি প্রীতি ও কর্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর-কোথাও নাই। মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান— এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি। এইজন্য মানবসংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক— কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা— সেই উপাসনাদ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।

এ কথা সকলেই জানেন, অনেক সময়ে মানুষ যাহাকে উপায়রূপে

আশ্রয় করে তাহাকেই উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া লয়, যাহাকে রাজ্যলাভের সহায়মাত্র বলিয়া ডাকিয়া লয় সেই রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। আমাদের ধর্মসমাজ-রচনাতেও সে বিপদ আছে। আমরা ধর্মলাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টারচিত সামগ্রী আমাদের সমস্ত মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লয় যে, ধর্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে, তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তখন, আমাদের সমাজের বাহিরে যে আর-কোথাও ধর্মের স্থান থাকিতে পারে সে কথা স্বীকার করিতে কষ্টবোধ হয়। ইহা হইতে ধর্মের বৈষয়িকতা আসিয়া পড়ে। দেশলুব্ধগণ যে ভাবে দেশ জয় করিতে বাহির হয় আমরা সেই ভাবেই ধর্মসমাজের ধ্বজা লইয়া বাহির হই। অন্যান্য দলের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দলের লোকবল, অর্থবল, আমাদের দলের মন্দিরসংখ্যা গণনা করিতে থাকি। মঙ্গলকর্মে মঙ্গলসাধনের আনন্দ অপেক্ষা মঙ্গলসাধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড়ো হইয়া উঠে। দলাদলির আগুন কিছুতেই নেবে না, কেবলই বাড়িয়া চলিতে থাকে। আমাদের এখনকার প্রধান কর্তব্য এই যে, ধর্মকে যেন আমরা ধর্মসমাজের হস্তে পীড়িত হইতে না দিই। ব্রহ্ম ধন্য— তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বজীবে ধন্য— তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ ধর্মপ্রণালীর নহেন, তাঁহাকে লইয়া ধর্মের বিষয়কর্ম ফাঁদিয়া বসা চলে না। ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন, স্বে মহিম্নি। আপন মহিমাতে। তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে, আমাদের রচনার মধ্যে নহে।

ফাল্গুন ১৩১০

বর্ষশেষ

পুরাতন বর্ষের সূর্য পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে নিঃশব্দে অস্তমিত হইল। যে-কয়বৎসর পৃথিবীতে কাটাইলাম অদ্য তাহারই বিদায়যাত্রার নিঃশব্দ পক্ষধ্বনি এই নির্বাণালোক নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি। সে অজ্ঞাত সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো কোথায় চলিয়া গেল তাহার আর কোনো চিহ্ন নাই।

হে চিরদিনের চিরন্তন, অতীত জীবনকে এই-যে আজ বিদায় দিতেছি এই বিদায়কে তুমি সার্থক করো ; আশ্বাস দাও যে, যাহা নষ্ট হইল বলিয়া শোক করিতেছি তাহার সকলই যথাকালে তোমার মধ্যে সফল হইতেছে। আজি যে প্রশান্ত বিষাদ সমস্ত সন্ধ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়কে আবৃত করিতেছে, তাহা সুন্দর হউক, মধুময় হউক, তাহার মধ্যে অবসাদের ছায়ামাত্র না পড়ুক। আজ বর্ষাবসানের অবসানদিনে বিগত জীবনের উদ্দেশে আমাদের ঋষি পিতামহদিগের আনন্দময় মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারণ করি,

> ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
> মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
> মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
> মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ। ওঁ।

বায়ু মধু বহন করিতেছে। নদী সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করিতেছে। ওষধী বনস্পতি সকল মধুময় হউক। রাত্রি মধু হউক, ঊষা মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক। সূর্য মধুমান হউক।

রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের

স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লিঝংকারস্থপ্ত অন্ধকারের মতো হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন শূন্যতা রাখিয়া যায় না, তাহা যেন পূর্ণতার জন্য স্থান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়।

যে বিষাদ ধ্যানের পূর্বাভাস, যে শান্তি মঙ্গলকর্মনিষ্ঠার জননী, যে বৈরাগ্য উদার প্রেমের অবলম্বন, যে নির্মল শোক তোমার নিকটে আত্মসমর্পণের মন্ত্রগুরু, তাহাই আজিকার আসন্ন রজনীর অগ্রগামী হইয়া আমাদিগকে সন্ধ্যাদীপোজ্জ্বল-গৃহ-প্রত্যাগত শ্রান্ত বালকের মতো অঞ্চলের মধ্যে আবৃত করিয়া লউক।

পৃথিবীতে সকল বস্তুই আসিতেছে এবং যাইতেছে— কিছুই স্থির নহে, সকলই চঞ্চল— বর্ষশেষের সন্ধ্যায় এই কথাই তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহা আছে, যাহা চিরকাল স্থির থাকে, যাহাকে কেহই হরণ করিতে পারে না, যাহা আমাদের অন্তরের অন্তরে বিরাজমান— গত বর্ষে সেই ধ্রুবের কি কোনো পরিচয় পাই নাই, জীবনে কি তাহার কোনো লক্ষণ চিহ্নিত হয় নাই? সকলই কি কেবল আসিয়াছে এবং গিয়াছে? আজ স্তব্ধভাবে ধ্যান করিয়া বলিতেছি তাহা নহে— যাহা আসিয়াছে এবং যাহা গিয়াছে তাহার কোথাও যাইবার সাধ্য নাই; হে নিস্তব্ধ, তাহা তোমার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। যে তারা নিবিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে নিবে নাই, যে পুষ্প ঝরিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে বিকশিত; আমি যাহার লয় দেখিতেছি তোমার নিকট হইতে তাহা কোনোকালেই চ্যুত হইতে পারে না। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে শান্ত হইয়া তোমার মধ্যে নিখিলের সেই স্থিরত্ব অনুভব করি। বিশ্বের প্রতীয়মান চঞ্চলতাকে অবসানকে

বিচ্ছেদকে আজ একেবারে ভুলিয়া যাই। গত বৎসর যদি তাহার উড্ডীন পক্ষপুটে আমাদের কোনো প্রিয়জনকে হরণ করিয়া যায় তবে হে পরিণামের আশ্রয়, করজোড়ে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমারই প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলাম। জীবনে যে তোমার ছিল মৃত্যুতেও সে তোমারই। আমি তাহার সহিত আমার বলিয়া যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা ক্ষণকালের, তাহা ছিন্ন হইয়াছে। আজ তোমারই মধ্যে তাহার সহিত যে সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছি তাহার আর বিচ্ছেদ নাই। সেও তোমার ক্রোড়ে আছে, আমিও তোমার ক্রোড়ে রহিয়াছি। অসীম জগদরণ্যের মধ্যে আমিও হারাই নাই, সেও হারায় নাই— তোমার মধ্যে অতি নিকটে, অতি নিকটতম স্থানে তাহার সাড়া পাইতেছি।

বিগত বৎসর যদি আমার কোনো চিরপালিত অপূর্ণ আশাকে শাখাচ্ছিন্ন করিয়া থাকে তবে হে পরিপূর্ণস্বরূপ, অদ্য নতমস্তকে একান্ত ধৈর্যের সহিত তাহাকে তোমার নিকটে সমর্পণ করিয়া ক্ষত উদ্যমে পুনরায় বারিসেচন করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তুমি আমাকে পরাভূত হইতে দিয়ো না। একদিন তোমার অভাবনীয় কৃপাবলে আমার অসিদ্ধ সাধনগুলিকে অপূর্বভাবে সম্পূর্ণ করিয়া স্বহস্তে সহসা আমার ললাটে স্থাপনপূর্বক আমাকে বিস্মিত ও চরিতার্থ করিবে, এই আশাই আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম।

যে-কোনো ক্ষতি, যে-কোনো অন্যায়, যে-কোনো অবমাননা বিগত বৎসর আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকুক— কার্যে যে-কোনো বাধা, প্রণয়ে যে-কোনো আঘাত, লোকের নিকট হইতে যে-কোনো প্রতিকূলতা দ্বারা আমাকে পীড়ন করিয়া থাক্— তবু তাহাকে আমার মস্তকের উপরে তোমারই আশিস-হস্তস্পর্শ বলিয়া অদ্য তাহাকে প্রণাম করিতেছি। গত বৎসরের প্রথম দিন নীরব স্মিতমুখে তাহার বস্ত্রাঞ্চলের

মধ্যে তোমার নিকট হইতে আমার জন্য কী লইয়া আসিয়াছিল সেদিন তাহা আমাকে জানায় নাই— আমাকে কী যে দান করিল আজ তাহাও আমাকে বলিয়া গেল না, মুখ আবৃত করিয়া নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। দিনে রাত্রিতে আলোকে অন্ধকারে তাহার সুখদুঃখের দূতগুলি আমার হৃদয়গুহাতলে কী সঞ্চিত করিয়া গেল সে সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রম আছে, আমি নিশ্চয় কিছুই জানি না— একদিন তোমার আদেশে ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে যাহা দেখিব তাহার জন্য আগে হইতেই অদ্য সন্ধ্যায় বর্ষাবসানকে ভক্তির সহিত প্রণতি করিয়া কৃতজ্ঞতার বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছি।

এই বর্ষশেষের শুভ সন্ধ্যায় হে নাথ, তোমার ক্ষমা মস্তকে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গলভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করি। আগামী বর্ষে যেন ধৈর্যের সহিত সহ্য করি, বীর্যের সহিত কর্ম করি, আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্বদা সর্বত্র সঞ্চরণ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

১৩০৮ [বর্ষশেষ]

নববর্ষ

যে অক্ষরপুরুষকে আশ্রয় করিয়া— অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি— দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃসূর্যকিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে, তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। তিনি এখনই কহিলেন, পুত্র, আমার এই নীলাম্বরবেষ্টিত তৃণধান্যশ্যামল ধরণীতলে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে বর দিলাম— তুমি আনন্দিত হও, তুমি বললাভ করো।

প্রান্তরের মধ্যে পুণ্যনিকেতনে নববর্ষের প্রথম নির্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক। মানবজীবনের যে মহোচ্চ সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে বসিতে স্থান দিয়াছেন তাহা আজ আমরা নবগৌরবে অনুভব করিব। আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই-যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধন্য। এই-যে চিরপুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধন্য। এই-যে গীতগন্ধবর্ণস্পন্দনে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিত্তশতদল জ্যোতিঃপরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে আমরা ধন্য। অদ্যকার প্রভাতে এই-যে জ্যোতির্ধারা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ইহার মধ্যে তোমার অমৃত আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব; এই-যে বৃষ্টিধৌত বিশাল পৃথিবীর বিস্তীর্ণ শ্যামলতা ইহার মধ্যে তোমার

অমৃত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব; এই-যে নিশ্চল মহাকাশ আমাদের মস্তকের উপর তাহার স্থির হস্ত স্থাপন করিয়াছে তাহা তোমারই অমৃতভারে নিস্তব্ধ, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব।

এই মহিমান্বিত জগতে অদ্যকার নববর্ষদিন আমাদের জীবনের মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া আনিল— এই পৃথিবীতে বাস করিবার গৌরব, এই আলোকে বিচরণ করিবার গৌরব, এই আকাশতলে আসীন হইবার গৌরব— তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করি তবে আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। তবে সেই ঋষিবাক্য বুঝিতে পারি—

কোহেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণধারণ করিত, যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন।

আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত। তিনি আনন্দিত তাই সূর্যলোকের বিরাট যজ্ঞহোমে অগ্নি-উৎস উৎসারিত; তিনি আনন্দিত তাই পৃথিবীর সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া তৃণদল সমীরণে কম্পিত হইতেছে; তিনি আনন্দিত তাই গ্রহে নক্ষত্রে আলোকের অনন্ত উৎসব। আমার মধ্যে তিনি আনন্দিত তাই আমি আছি; তাই আমি গ্রহতারকার সহিত, লোকলোকান্তরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত— তাঁহার আনন্দে আমি অমর, সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার সমান মর্যাদা।

তাঁহার প্রতিনিমেষের ইচ্ছাই আমাদের প্রতিমুহূর্তের অস্তিত্ব, আজ নববর্ষের দিনে এই কথা যদি উপলব্ধি করি— আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষয় আনন্দ যদি স্তব্ধ গভীর ভাবে অন্তরে উপভোগ করি— তবে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া

অভিভূত হইব না; কারণ ঘটনাবলী তাহার সুখদুঃখ বিরহমিলন লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়। বৃহত্তম বিপদই বা কতদিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে—তাঁহার আনন্দ থাকে; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্য। এই রহস্য ভেদ না করিতে পারি, নাই পারিলাম— আমাদের বোধশক্তিতে এই শাশ্বত আনন্দ এত বিপরীত আকারে, এত বিবিধ ভাবে কেন প্রতীয়মান হইতেছে তাহা নাই জানিলাম— কিন্তু ইহা যদি নিশ্চয় জানি, এক মুহূর্ত সর্বত্র সেই পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়; যদি জানি,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি

তবে

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোনো অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।

স্বার্থের জড়তা এবং পাপের আবর্ত ব্রহ্মের এই নিত্যবিরাজমান আনন্দের অনুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তখন সহস্র রাজা আমাদের নিকট হইতে করগ্রহণে উদ্যত হয়, সহস্র প্রভু আমাদিগকে সহস্র কাজে চারি দিকে ঘূর্ণ্যমান করে। তখন যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বড়ো হইয়া উঠে— তখন সকল বিরহই ব্যাকুল, সকল বিপদই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে— সকলকেই চূড়ান্ত বলিয়া ভ্রম হয়। লোভের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেই মনে হয় তাহাকে না পাইলে নয়, বাসনার বিষয় উপস্থিত

হইলেই মনে হয় ইহাকে পাইলেই আমার চরম সার্থকতা। ক্ষুদ্রতার এইসকল অবিশ্রাম ক্ষোভে ভূমা আমাদের নিকটে অগোচর হইয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদিগকে প্রতিপদে অপমানিত করিয়া যায়।

সেইজন্যই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে,

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও; প্রতি নিমেষের খণ্ডতা হইতে তোমার অনন্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে আমাকে উপনীত করো; অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও; অহংকারের যে অন্তরাল, বিশ্বজগৎ আমার সম্মুখে যে স্বাতন্ত্র্য লইয়া দাঁড়ায়, আমাকে এবং জগৎকে তোমার ভিতর দিয়া না দেখিবার যে অন্ধকার তাহা হইতে আমাকে মুক্ত করো; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও— আমার প্রবৃত্তি আমাকে মৃত্যুদোলায় চড়াইয়া দোল দিতেছে, মুহূর্তকাল অবসর দিতেছে না; আমার মধ্যে আমার ইচ্ছাগুলাকে খর্ব করিয়া আমার মধ্যে তোমার আনন্দকে প্রকাশমান করো, সেই আনন্দই অমৃতলোক।

আজিকার নববর্ষদিনে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য আমরা করপুট করিয়া দাঁড়াইয়াছি। বলিতেছি—

আবিরাবীর্মএধি।

হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও।

অন্তরে বাহিরে তুমি উদ্‌ভাসিত হইলেই, প্রবৃত্তির দাসত্ব, জগতের দৌরাত্ম্য কোথায় চলিয়া যায়— তখন তোমার মধ্যে সমস্ত দেশকালের একটি অনবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য, একটি পরিপূর্ণ সমাপ্তি দেখিয়া সুগভীর শান্তির

মধ্যে আমরা নিমগ্ন ও নিস্তব্ধ হইয়া যাই। তখন, যে চেষ্টাহীন বলে সমস্ত জগৎ সহজে বিধৃত তাহা আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, যে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যে নিখিলভুবন পরস্পর গ্রথিত তাহা আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়। তখন, আমি যে তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, এ কথা মনে থাকে না— তোমার সমস্ত জগতের এক সঙ্গে তুমিই আমাকে লইতেছ, এই কথাই আমার মনে হয়।

সেই স্বপ্রকাশ যতদিন না আমাদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিবেন ততদিন যেন নিজের ভিতর হইতে তাঁহার দিকে বাহির হইবার একটা দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সেই পথ দিয়া প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া আসিতে পারি। আমাদের জীবনের একটা দিনের সহিত আর-একটা দিনের যে বন্ধন সে যেন শুধু স্বার্থের বন্ধন না হয়, জড় অভ্যাসসূত্রের বন্ধন না হয়— একটা বৎসরের সহিত আর-একটা বৎসরকে যেন প্রাত্যহিক নিবেদনের দ্বারা তাঁহারই সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি। এমন কোনো সূত্রে যেন মানবজীবনের দুর্লভ মুহূর্তগুলিকে না বাঁধিতে থাকি যাহা মৃত্যুর স্পর্শমাত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীবনের যে বৎসরটা গেছে তাহা পূজার পদ্মের ন্যায় তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই; তাহার তিন শত পঁয়ষট্টি দল দিনে দিনে ছিন্ন করিয়া লইয়া পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছি। অদ্য বৎসরের অনুদ্‌ঘাটিত প্রথম মুকুল সূর্যের আলোকে মাথা তুলিয়াছে— ইহাকে আমরা খণ্ডিত করিব না, সৌন্দর্যে সৌগন্ধ্যে শুভ্রতায় ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব। তাহা কখনোই অসাধ্য নহে— সে শক্তি আমাদের মধ্যে আছে—

নাত্মানমবমন্যেত।

নিজেকে অপমান অবজ্ঞা করিয়ো না।

ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা।

আপনাকে যে ব্যক্তি দীন বলিয়া অবমান করে তাহার কখনোই শোভন ঐশ্বর্য লাভ হয় না।

ধর্মের যে আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ, যে আদর্শে ব্রহ্মের জ্যোতি বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা কল্পনাগম্য অসাধ্য নহে; তাহা রক্ষা করিবার তেজ আমাদের মধ্যে আছে, নিজেকে জাগ্রত রাখিবার শক্তি আমাদের আছে, এবং জাগ্রত থাকিলে অন্যায় অসত্য হিংসা ঈর্ষা প্রলোভন দ্বারের নিকটে আসিয়া দূরে চলিয়া যায়। আমরা ভয় ত্যাগ করিতে পারি, হীনতা পরিহার করিতে পারি, আমরা প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি— এ ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের আছে। কেবল দীনতায় সেই শক্তিকে অবিশ্বাস করি বলিয়া তাহাকে ব্যবহার করিতে পারি না। সেই শক্তি আমাদিগকে কী ভূমানন্দে, কী চরম সার্থকতায় লইয়া যাইতে পারে তাহা জানি না বলিয়াই আত্মার সেই শক্তিকে আমরা স্বার্থে এবং ব্যর্থ চেষ্টায় এবং পাপের আয়োজনে নিযুক্ত করি। মনে করি, অর্থলাভেই আমাদের চরম সুখ, বাসনাতৃপ্তিতেই আমাদের পরমানন্দ, ইচ্ছার বাধা-মোচনেই আমাদের পরম মুক্তি। আমাদের যে শক্তি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহাকে একাগ্রধারায় ব্রহ্মের দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলে জীবনের কর্ম সহজ হয়, সুখদুঃখ সহজ হয়, মৃত্যু সহজ হয়। সেই শক্তি আমাদিগকে বর্ষার স্রোতের মতো অনায়াসেই বহন করিয়া লইয়া যায়; দুঃখশোক বিপদ-আপদ বাধাবিঘ্ন তাহার পথের সম্মুখে শরবনের মতো মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

পুনর্বার বলিতেছি, এই শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। কেবল, চারি দিকে ছড়াইয়া আছে বলিয়াই তাহার উপর নিজের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া গতিলাভ করিতে পারি না। নিজেকে প্রত্যহ নিজেই বহন করিতে হয়। প্রত্যেক কাজ আমাদের স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়ে;

প্রত্যেক কাজের আশানৈরাশ্য লাভক্ষতির সমস্ত ঋণ নিজেকে শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিতে হয়। স্রোতের উপর যেমন মাঝির নৌকা থাকে এবং নৌকার উপরেই তাহার সমস্ত বোঝা থাকে, তেমনি ব্রহ্মের প্রতি যাঁহার চিত্ত একাগ্রভাবে ধাবমান তাঁহার সমস্ত সংসার এই পরিপূর্ণ ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায় এবং কোনো বোঝা তাঁহার স্কন্ধকে পীড়িত করে না।

নববর্ষের প্রাতঃসূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অদ্য আমাদের হৃদয়কে চারি দিক হইতে আহ্বান করি। ভারতবর্ষের যে পৈতৃক মঙ্গলশঙ্খ গৃহের প্রান্তে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া আছে সমস্ত প্রাণের নিশ্বাস তাহাতে পরিপূর্ণ করি— সেই মধুর গম্ভীর শঙ্খধ্বনি শুনিলে আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত অহংকার হইতে, স্বার্থ হইতে, বিলাস হইতে, প্রলোভন হইতে ছুটিয়া আসিবে। আজ শতধারা একধারা হইয়া গোমুখীর মুখনিঃসৃত সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইবে— তাহা হইলে মুহূর্তের মধ্যে প্রান্তরশায়ী এই নির্জন তীর্থ যথার্থই হরিদ্বারতীর্থ হইয়া উঠিবে।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, অদ্য নববর্ষের প্রভাতে তোমার জ্যোতিঃস্নাত তরুণ সূর্য পুরোহিত হইয়া নিঃশব্দে আমাদের আলোকের অভিষেক সম্পন্ন করিল। আমাদের ললাটে আলোক স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের দুই চক্ষু আলোকে ধৌত হইয়াছে। আমাদের পথ আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে। আমাদের সদ্যোজাগ্রত হৃদয় ব্রতগ্রহণের জন্য তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছে। যে শরীরকে অদ্য তোমার সমীরণ স্পর্শ করিল তাহাকে যেন প্রতিদিন পবিত্র রাখিয়া তোমার কর্মে নিযুক্ত করি। যে মস্তকে তোমার প্রভাতকিরণ বর্ষিত হইল সে মস্তককে ভয় লজ্জা ও হীনতার অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া তোমারই পূজায় প্রণত করি। তোমার নামগানধারা আজ প্রত্যূষে যে হৃদয়কে পুণ্যবারিতে স্নান করাইল সে যেন আনন্দে

পাপকে পরিহার করিতে পারে, আনন্দে তোমার কল্যাণকর্মে জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারে, আনন্দে দারিদ্র্যকে ভূষণ করিতে পারে, আনন্দে দুঃখকে মহীয়ান্ করিতে পারে, এবং আনন্দে মৃত্যুকে অমৃতরূপে বরণ করিতে পারে। আজিকার প্রভাতকে কালি যেন বিস্মৃত না হই। প্রতি দিনের প্রাতঃসূর্য যেন আমাদিগকে লজ্জিত না দেখে; তাহার নির্মল আলোক আমাদের নির্মলতার, তাহার তেজ আমাদের তেজের সাক্ষী হইয়া যায়— এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে আমাদের প্রত্যেক দিনটিকে নির্মল অর্ঘ্যের ন্যায় তাহার রক্তিম স্বর্ণথালিতে বহন করিয়া তোমার সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারে। হে পিতা, আমার মধ্যে নিয়তকাল তোমার যে আনন্দ স্তব্ধ হইয়া আছে, যে আনন্দে তুমি আমাকে নিমেষকালও পরিত্যাগ কর নাই, যে আনন্দে তুমি আমাকে জগতে জগতে রক্ষা করিতেছ, যে আনন্দে সূর্যোদয় প্রতিদিনই আমার নিকটে অপূর্ব, সূর্যাস্ত প্রতি সন্ধ্যায় আমার নিকট রমণীয়, যে আনন্দে অজ্ঞাত ভুবন আমার আত্মীয়, অগণ্য নক্ষত্র আমার সুপ্তরাত্রির মণিমাল্য, যে আনন্দে জন্মমাত্রেই আমি বহুলোকের প্রিয় পরিচিত, সমস্ত অতীত মানবের মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকারী, যে আনন্দে দুঃখ নৈরাশ্য বিপদ মৃত্যু কিছুই লেশমাত্র নিরর্থক নহে— আমি যেন প্রবৃত্তির ক্ষোভে, পাপের লজ্জায় আমার মধ্যে তোমার সেই আনন্দ-মন্দিরের দ্বার নিজের নিকটে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া পথের পঙ্কে যদৃচ্ছা লুণ্ঠিত হওয়াকেই আমার সুখ, আমার স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম না করি। জগৎ তোমার জগৎ, আলোক তোমার আলোক, প্রাণ তোমার নিশ্বাস, এই কথা স্মরণে রাখিয়া জীবনধারণের যে পরম পবিত্র গৌরব তাহার অধিকারী হই, অস্তিত্বের যে অপার অজ্ঞেয় রহস্য তাহা বহন করিবার উপযুক্ত হই— এবং প্রতিদিন তোমাকে এই বলিয়া ধ্যান করি—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

বিশ্বসবিতা এই-সমস্ত ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন, তেমনি তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন— তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি, তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

১৩০৯

উৎসবের দিন

সকালবেলায় অন্ধকার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হয়, অমনি বনে উপবনে পাখিদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে উৎসব কিসের উৎসব? কেন এই-সমস্ত বিহঙ্গের দল নাচিয়া-কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠে? তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখিরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তি অনুভব করে। দেখিবার শক্তি, উড়িবার শক্তি, খাদ্যসন্ধান করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে—আলোকে উদ্ভাসিত এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে সে আপনার প্রাণবান গতিবান চেতনাবান পক্ষিজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সংগীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের যেখানে অব্যাহত শক্তির প্রচুর প্রকাশ সেইখানেই যেন মূর্তিমান উৎসব। সেইজন্য হেমন্তের সূর্যকিরণে অগ্রহায়ণের পক্কশস্যসমুদ্রে সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে, সেইজন্য আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে আমরা নানা স্থানে নানা ভাবে শক্তির জয়োৎসব দেখিতে পাই।

মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না; যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন না; যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে

ক্রীড়াপুত্তলির মতো ক্ষুদ্র ও জড় -ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে— সেদিন তো আমরা জড়ের মতো, উদ্ভিদের মতো, সাধারণ জন্তুর মতো— সেদিন তো আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করি না— সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কর্মে ক্লিষ্ট, সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না, সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না, সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সংগীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

হে ভ্রাতৃগণ, আজ আমি তোমাদের সকলকে ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি; আজ আলোক জ্বলিয়াছে, সংগীত ধ্বনিতেছে, দ্বার খুলিয়াছে; আজ মনুষ্যত্বের গৌরব আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে; আজ আমরা কেহ একাকী নহি, আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক; আজ অতীত সহস্র বৎসরের অমৃতবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে; আজ অনাগত সহস্র বৎসর আমাদের কণ্ঠস্বরকে বহন করিবার জন্য সম্মুখে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আজ আমাদের কিসের উৎসব? শক্তির উৎসব। মানুষের মধ্যে কী আশ্চর্যশক্তি আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে! আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কোন্ ঊর্ধ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, কর্মী কর্মের কোন্ অশ্রান্ত দুঃসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছে! জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ

করিয়াছে, আজ আমরা সেই শক্তির গৌরব স্মরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়। প্রতিদিন আমরা যে অন্নগ্রহণ করিতেছি তাহার পশ্চাতে মানুষের বুদ্ধি, মানুষের উদ্যম, মানুষের উদ্‌যোগ রহিয়াছে— আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব এক দিনের জন্যও নাই, মানুষ উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শক্তির দ্বারা আপন অভাবকে জয় করিয়া মানুষকে আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে; গাত্রবস্ত্র মনুষ্যত্বের গৌরব। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই, আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্মাণ করিতে হইয়াছে; কোমল ত্বক্ এবং দুর্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন, তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

মানুষের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজনসাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত; তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে কোন্ মহাসমুদ্র হইতে এ কী জোয়ার আসিয়াছে— সে আমাদের সমস্ত অভাবের কূল ছাপাইয়া, সমস্ত প্রয়োজনকে লঙ্ঘন করিয়া, অহর্নিশি অক্লান্ত উদ্যমের সহিত এ কোন্ অসীমের রাজ্যে, কোন্ অনির্বচনীয় আনন্দের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। যাহাকে জানিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছে

তাহাকে জানিবার ইহার কী প্রয়োজন! যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ইহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ইহার আবশ্যকের সম্বন্ধ কোথায়! যাহার কর্ম করিবার জন্য এ আপনার আরাম, স্বার্থ, এমন কি প্রাণকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে, তাহার সঙ্গে ইহার দেনাপাওনার হিসাব লেখা থাকিতেছে কই! আশ্চর্য। ইহাই আশ্চর্য। আনন্দ। ইহাই আনন্দ। যেখানটা মানুষের সমস্ত আবশ্যকসীমার বাহিরে চলিয়া গেছে সেইখানেই মানুষের গভীরতম সর্বোচ্চতম শক্তি সর্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। জগতের আর কোথাও ইহার কোনো তুলনা দেখি না। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব অদ্যকার উৎসবে আনন্দসংগীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, ভয়শোকের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। আজ অতীত-ভবিষ্যতের সুমহান মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপনপূর্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরন্তনশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক করিব।

একদা কত সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ এই কথা বলিয়াছে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি যিনি জ্যোতির্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্তী।

এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবশ্যক যে, কোথায় আমাদের খাদ্য, কোথায় আমাদের খাদক, কোথায় আমাদের আরাম, কোথায় আমাদের ব্যাঘাত— কিন্তু এই-সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চিররহস্য অন্ধকারের এ কোন্ পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্লোকে কিসের প্রত্যাশায় চলিয়া গেছে! মানুষ এই-যে তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভ্যন্তরেও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছে, আজ আমরা মানুষের সেই আশ্চর্য জ্ঞানের গৌরব লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সংকীর্ণতা,

কোনো নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সীমাহীনের মধ্যে পরম সাহসের সহিত আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয়, যে তেজস্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে পরন্তু চরমশক্তিরূপেই অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর— মনুষ্যত্বের মধ্যে অদ্য আমরা সেই জ্ঞান, সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কত সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ একদা এই কথা উচ্চারণ করিয়াছে—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল দুর্বলকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি বিচ্ছেদ মৃত্যু প্রতি দিনের ঘটনা, বিপদ যেখানে অদৃশ্য থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায় যেখানে অধিকাংশ স্থলে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, সেখানে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে মস্তক তুলিয়া এ কী কথা বলিয়াছে যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন! আজ আমরা দুর্বল মানুষের মুখের এই প্রবল অভয়বাণী লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। সহস্রশীর্ষ ভয়ের করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, ভয় নাই— অদ্য আপনাকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব লাভ করিব।

বহু সহস্র বৎসর পূর্বের উচ্চারিত এই বাণী আজিও ধ্বনিত হইতেছে—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

অন্তরতর এই যে আত্মা ইনি এই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়।

সংসারের সমস্ত স্নেহপ্রেমের সামগ্রীর মধ্যে মানুষের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই— সংসারের সমস্ত প্রিয়পদার্থের অন্তরে তাহার অন্তরতর যে প্রিয়তম, যিনি সমস্ত আত্মীয়পরের অন্তরতর, যিনি সমস্ত দূর-নিকটের অন্তরতর, তাঁহার প্রতি যে প্রেম এমন প্রবল আবেগে, এমন অসংশয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে— আমরা জানি, মানুষের যে পরমতম প্রেম আপনার সমস্ত প্রিয়সামগ্রীকে এক মুহূর্তে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়, মানুষের সেই পরমাশ্চর্য প্রেমশক্তির গৌরব অদ্য আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমাগত হইয়াছি।

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি; স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে— বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্যবশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং॥
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে— ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই-যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে; আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস্ করিতে পারি না; এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি; সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে

দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না— ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে; ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য, ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে এক মুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত বিস্মৃত ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গল-শক্তির মহান আবির্ভাব ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহার গৌরব হইতে, তাহার সহায়তা হইতে, মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে সমস্ত-স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষের এই-সকল মহত্ত্ব আজ আমাদের দীনতমকে আমাদের শ্রেষ্ঠতমের সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। আজ আমরা মানুষের এই-সকল অবারিত সাধারণসম্পদের সমান অধিকারের সূত্রে ভাই হইয়াছি; আজ মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃসম্মিলন।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি, ফাল্গুনের পুষ্পপর্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি, মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি; কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা যে শত শত অভ্রভেদী শিখরমালায় জাগ্রত-বিরাজিত, সেখানে সেই উত্তুঙ্গ শৈলাশ্রমে আমরা

মানবমাহাত্ম্যের ঈশ্বরকে মানবসংঘের মধ্যে বসিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি।

আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত উৎসবই এই মহান ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনাকে উৎসবের ঘটনা করিয়াছি তাহার প্রত্যেকটাতেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জন্মোৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি নাই। এই-সকল উৎসবে আমরা সংকীর্ণতা বিসর্জন দিই; সেদিন আমাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মীয়স্বজনের জন্য নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, রবাহুত-অনাহুতের জন্য। পুত্র যে জন্মগ্রহণ করে সে আমার ঘরে নহে, সমস্ত মানুষের ঘরে। সমস্ত মানুষের গৌরবের অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্ম-মঙ্গলের আনন্দে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করিব না? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইত তবে তাহার মতো দীনহীন জগতে আর কে থাকিত! সমস্ত মানুষ যে তাহার জন্য অন্ন বস্ত্র আবাস ভাষা জ্ঞান ধর্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের অন্তরস্থিত সেই নিত্যচেতন মঙ্গলশক্তির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সে যে এক মুহূর্তে ধন্য হইয়াছে। তাহার জন্ম উপলক্ষ্যে একদিন গৃহের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া যদি সমস্ত মানুষকে স্মরণ না করি, তবে কবে করিব! অন্য সমাজ যাহাকে গৃহের ঘটনা করিয়াছে ভারতসমাজ তাহাকে জগতের ঘটনা করিয়াছে, এবং এই জগতের ঘটনাই জগদীশ্বরের পূর্ণমঙ্গল আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার যথার্থ অবকাশ। বিবাহব্যাপারকেও ভারতবর্ষ কেবলমাত্র পতিপত্নীর আনন্দমিলনের ঘটনা বলিয়া জানে না। প্রত্যেক মঙ্গলবিবাহকে মানবসমাজের এক-একটি স্তম্ভস্বরূপ জানিয়া ভারতবর্ষ তাহা সমস্ত

মানবের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে ; এই উৎসবেও ভারতের গৃহস্থ সমস্ত মনুষ্যকে অতিথিরূপে গৃহে অভ্যর্থনা করে— তাহা করিলেই যথার্থভাবে ঈশ্বরকে গৃহে আবাহন করা হয়, শুদ্ধমাত্র ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেই হয় না। এইরূপে গৃহের প্রত্যেক বিশেষ ঘটনায় আমরা এক-একদিন গৃহকে ভুলিয়া সমস্ত মানবের সহিত মিলিত হই, এবং সেইদিন সমস্ত মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলনের দিন।

হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। এত কালে যাহা বিনয়রসাপ্লুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল এখন তাহা ঐশ্বর্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হৃদয় সংকুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনী মানী ছাড়া মঙ্গলকর্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারও স্থান হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকে দূর করিয়া, নিজেকে বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্র প্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া, বড়ো হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর, খাদ্য প্রচুরতর, আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে ; কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা, আমাদের দীনতা, আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতা। আড়ম্বর দিনে দিনে যতই বাড়িতেছে ততই এই দীপালোকে, এই গৃহসজ্জায়, এই রসলেশশূন্য কৃত্রিমতার মধ্যে, সেই শান্তমঙ্গলস্বরূপের প্রশান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমাদের মদান্ধ দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার স্বর্ণরৌপ্যের চাকচিক্য দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান করো। বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান করো। আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধমাত্র মাধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে ; আজ বৃহৎ

সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তিসংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব, প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য হইতে উদ্‌বোধিত করো; প্রতি দিনের নির্বীর্য নিশ্চেষ্টতা হইতে, আরাম-আবেশ হইতে উদ্ধার করো। যে কঠোরতায়, যে উদ্যমে, যে আত্মবিসর্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করো। আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়াছি। আজ যদি, যুগে যুগে তোমার মনুষ্যসমাজের মধ্যে যে সত্যের গৌরব, যে প্রেমের গৌরব, যে মঙ্গলের গৌরব, যে কঠিনবীর্য নির্ভীক মহত্ত্বের গৌরব উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না দেখিতে পাই, দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক, তুচ্ছ ধনের আড়ম্বর, তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল— যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে-সকল অভয়বাণী অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে তাহা যদি মহাকালের মঙ্গলশঙ্খনির্ঘোষের মতো আজ না শুনিতে পাই, শুনি কেবল লৌকিকতার কলকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগ্‌বিন্যাস, তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। এই-সমস্ত ধনাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া একবার সেই-সমস্ত পবিত্র দৃশ্যের মধ্যে লইয়া যাও যেখানে ধূলিশয্যায় নগ্নদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন, যেখানে তোমার সর্বত্যাগী সেবক কর্তব্যের কঠিনপথে রিক্তহস্তে ধাবমান হইয়াছেন— যেখানে তোমার বরপুত্রগণ দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, বিষয়ীদের দ্বারা পরিত্যক্ত, মদান্ধদের দ্বারা অপমানিত। হায় দেব, সেখানে কোথায় দীপচ্ছটা, কোথায় বাদ্যোদ্যম, কোথায় স্বর্ণভাণ্ডার, কোথায় মণিমাল্য। কিন্তু সেইখানে তেজ, সেইখানে শক্তি, সেইখানে দিব্যৈশ্বর্য, সেইখানেই তুমি। দূর করো, দূর করো এই-সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন, এই-সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, এই-সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, এই-সমস্ত অপবিত্র আয়োজন— মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদিচূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও। সেখানে, সেই কঠিন

ক্ষেত্রে, সেই রিক্ত নির্জনতার মধ্যে, সেই বহুযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব, প্রভু।

দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো,
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

মাঘ ১৩১১

দুঃখ

জগৎসংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনই আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই তখনই, এ বিশ্বরাজ্যে দুঃখ কেন আছে এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে আমাদিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া তোলে। আমরা কেহ বা তাহাকে মানবপিতামহের আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি, কেহ বা তাহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়া জানি, কিন্তু তাহাতে দুঃখ তো দুঃখই থাকিয়া যায়।

না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন? এটা একবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্যকারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া?

উপনিষৎ বলিয়াছেন, যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই-সমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঈশ্বরের এই-যে প্রকাশ উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর-একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর-একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই

পারেন না; এই-যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলই ঘুরিতেছে ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই-সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়!

শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই, সেই কর্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল সংসারের সমস্ত দুঃখতাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়!

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কী করিয়া? আমাদের চিত্ত সংসারে আপনপরের ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা কেবলই আহত প্রতিহত হইতেছে; সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন!

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য-সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ কথা মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই, তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে— তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয়! রসো বৈ সঃ। তিনিই যে রসস্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেইজন্যই জগতের প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং— ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃতরূপ।

সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই, তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না, তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে; এবং যাহা-কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে— তখন কী বলিব, এ কী হইতেছে। নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই তো সব বলা হইল না— এমন কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য শক্তি ও আশ্চর্য সৌন্দর্যের কী বলা হইল। সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে, সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ তো কেবলমাত্র জল ও মাটি— মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ— কিন্তু, যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কী? তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি

উড়িয়া সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, কশাহত কালো ঘোড়ার মসৃণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার পরে সেই জলস্থল-আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল— সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধুলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই-সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই তো রস। ইহা তো শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে, ইহাই বীণার সংগীত। এই সংগীতেই আনন্দের পরিচয়, সেই আনন্দরূপমমৃতম্।

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে কত দূরেই ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্যসাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।

কে যেন বিশ্বমহোৎসবে এই নীলাকাশের মহাপ্রাঙ্গণে অপূর্ণতার পাত পাড়িয়া গিয়াছেন; সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিয়া গিয়াছি। সেই পূর্ণতা কত বিচিত্র রূপে এবং কত বিচিত্র স্বাদে ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে অভাবনীয় ও অনির্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

এমন নহিলে রসস্বরূপ রস দিবেন কেমন করিয়া। এই রস অপূর্ণতার সুকঠিন দুঃখকে কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়া উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে। এই দুঃখের সোনার পাত্রটি কঠিন বলিয়াই কি

ইহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া এত বড়ো রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে? না পরিবেষণের লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিব 'হোক হোক কঠিন হোক, কিন্তু ইহাকে ভরপুর করিয়া দাও, আনন্দ ইহাকে ছাপাইয়া উঠুক'?

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ, তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্যসহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ, দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে, তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

এ কথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কী করিয়া?

কিন্তু, অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনোদিনই আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখিতে পায় নাই— হঠাৎ কি কখনোই বলিয়া উঠে নাই 'বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি, আর কখনও সংশয় করিব না'? পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শুভমুহূর্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই? সেইদিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই—

যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব?

ইহা কি তর্কের বিষয়? ইহা কি আমাদের উপলব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই

মানুষ দুঃখকেই পূজা করিয়া আসিয়াছে, আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।

অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ, দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা-কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত-কিছু ধন সে তো তাহার নহে, সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের, কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই দুঃখের ঐশ্বর্যেই অপূর্ণ জীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপস্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি— তাহার অর্থই এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনি পূর্ণতার মূল্য আছে, তাহাই দুঃখ; সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা; সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ, মুক্তি, ঈশ্বর।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি? তাঁহারই ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই— আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন— নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্‌খানে! আমাদের এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তাঁহার সুধা তিনি দান করিতেন

কী করিয়া! এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। দানেই ঐশ্বর্যের পূর্ণতা। হে ভগবান, আনন্দকে দান করিবার, বর্ষণ করিবার, প্রবাহিত করিবার এই-যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক— তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি, আমাদের দুঃখের দ্বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড়ো অভিমান; এইখানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, এইখানেই তোমার ঐশ্বর্যে আমার ঐশ্বর্যে যোগ; এইখানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইখানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ; তুমি তোমার অগণ্য গ্রহসূর্যনক্ষত্র-খচিত মহাসিংহাসন হইতে আমাদের এই দুঃখের জীবনে তোমার লীলা সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছ। হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি; হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি— সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।

আমরা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে, আমরা সুখদুঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিত্তকে অসাড় করিয়া ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেরূপ উদাসীন হওয়া হয়তো অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু সুখদুঃখ তো কেবলই নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই তো সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।

অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে, বজ্রের আঘাতে, কত জাতি, কত রাজ্য, কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে; যেখানে সে মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং মানুষের চেষ্টাকে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষমারী অন্যায়-অত্যাচার তাহার সহায়; যেখানে রক্তসরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধরমূর্তিতে সুতীক্ষ্ণ লাঙল দিয়া সে মানবহৃদয়কে বারম্বার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না— সেই পরিত্রাণই মৃত্যু— সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

মানুষের এই-যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানবসমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে; এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, মানবসংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়া

গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা— যাহাকে যথার্থভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে দুঃখদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারাই যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোনো পন্থা নাই।

কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি, দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা-কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি— সুখের দ্বারা, আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্তি দেখিয়াছে দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব, যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

এই মূল্যটুকু ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে অবিমিশ্র সুখ ও আরামের মধ্যে লালিত করিয়া রাখেন, তবেই আমাদের অপূর্ণতা যথার্থ লজ্জাকর হয়, তাহার মর্যাদা

একেবারে চলিয়া যায়। তাহা হইলে কিছুকেই আর আপনার অর্জিত বলিতে পারি না, সমস্তই দানের সামগ্রী হইয়া উঠে। আজ ঈশ্বরের শস্যকে কর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমরা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের পানীয় জলকে বহনের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের অগ্নিকে ঘর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সহজে দিয়া আমাদের অসম্মান করেন নাই; ঈশ্বরের দানকেও বিশেষরূপে আমাদের করিয়া লইলে তবেই তাহাকে পাই, নহিলে তাহাকে পাই না। সেই দুঃখ তুলিয়া লইলে জগৎসংসারে আমাদের সমস্ত দাবি চলিয়া যায়, আমাদের নিজের কোনো দলিল থাকে না; আমরা কেবল দাতার ঘরে বাস করি, নিজের ঘরে নহে। কিন্তু তাহাই যথার্থ অভাব; মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মতো এত বড়ো অভাব আর-কিছু হইতেই পারে না।

উপনিষৎ বলিয়াছেন—

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্‌ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা-কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়— আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-এক দিক দিয়া বলা হইয়াছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে।

আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে, সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়ো তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ— জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

খৃস্টান শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক-কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসংগমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন, দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন— ইহাই খৃস্টানধর্মের মর্মকথা।

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদায়ের সাধকেরা ঈশ্বরকে দুঃখদারুণ ভীষণ মূর্তির মধ্যেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে মূর্তিকে বাহ্যত কোথাও তাঁহারা মধুর ও কোমল, শোভন ও সুখকর করিবার লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সংহাররূপকেই তাঁহারা জননী বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার মধ্যেই তাঁহারা শক্তি ও শিবের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা করেন।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য-শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে, ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্যই ঈশ্বরের মূর্তি,

সংসারসুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই সকরুণ, বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেইজন্যই এই-সকল দুর্বলচিত্ত সুখের পূজারিগণ্ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ। হে মাতা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই ভয়, তুমিই—

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।

তুমিই—

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ।

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎ-বদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ, সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, হে বিষ্ণু, তোমার উগ্র জ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মতো সংকুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়— সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না। তখন দয়াময় বলিয়া ভয়ে তোমার নিকটে দয়া চাহি, তোমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি, তোমার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার কাছে ক্রন্দন করি।

কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্বলভাবে নিজের আরামের, নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি— তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভুলাইব না; তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ, সেই-যে উদ্ধারের পথ সে তো আরামের পথ নহে, সে যে পরম দুঃখেরই পথ। মানুষের অন্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে—

আবিরাবীর্ম এধি।

হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও।

হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও— এ প্রকাশ তো সহজ নহে। এ-যে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মানুষের জ্ঞানে, মানুষের কর্মে, মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই। তোমাকে বলিয়াছেন,—

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।

হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে; তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখ কখন দেখি? যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে

মত্ত, খ্যাতির অহংকারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত, তখন? নহে নহে, কদাচ নহে। যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়া মান্য না করি— তখনই বধে-বন্ধনে আঘাতে-অপমানে দারিদ্র্যে-দুর্যোগে, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ এবং মৃত্যু, বিঘ্ন এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা সুখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল নাই, আলস্যে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভয়ংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা, উদ্যত চেষ্টার দ্বারা, অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব— কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না— এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশলাভ করিতে থাকুক, এই আশীর্বাদ করো। জাগাও হে জাগাও— যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন এক মুহূর্তে জাগাইয়া তুলিবে তখন, হে রুদ্র, সেই উদ্ধত ঐশ্বর্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি, এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই

দুঃসহ দুর্দিনকে আমরা যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

আবিরাবীর্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে ; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না। কারণ, সেই দয়াই দুর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা, এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে।

ফাল্গুন ১৩১৪

শান্তং শিবমদ্বৈতম্

অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশ দিকে ছুটিয়াছে; যিনি শান্তং তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না; জগতের সমস্ত চেষ্টা স্ব স্ব স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটিয়া অনন্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্যের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠাপড়া, কতই ভাঙাচোরা চলিতেছে; কত হানাহানি, কত বিপ্লব; তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অবিশ্রাম আঘাতচিহ্ন বিশ্বের চির-নূতন মুখচ্ছবিতে লক্ষ্যই করিতে পারি না। সংসারের অনন্ত চলাচল, অনন্ত কোলাহলের মর্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'। যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই শান্তং যে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইবে কী উপায়ে? সেই শান্তস্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে কেমন করিয়া? তাঁহার শান্তরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ হইবে কবে?

আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্তস্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের অতিক্ষুদ্র অশান্তিতে জগতের কতখানি যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই? নিভৃত নদীতীরে প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা দুজন মাত্র লোক যদি কলহ করি, তবে সায়াহ্নের যে অপরিমেয় স্নিগ্ধ নিঃশব্দতা আমাদের পদতলের তৃণাগ্র

হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, দুটি মাত্র অতিক্ষুদ্র ব্যক্তির অতিক্ষুদ্র কণ্ঠের কলকলায় তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। আমার মনের এতটুকু ভয়ে জগৎচরাচর বিভীষিকাময় হইয়া উঠে, আমার মনের এতটুকু লোভে আমার নিকটে সমস্ত বৃহৎ সংসারের মুখশ্রীতে যেন বিকার ঘটে। তাই বলিতেছি, যিনি শান্তং তাঁহাকে সত্যভাবে অনুভব করিব কী করিয়া যদি আমি শান্ত না হই? আমাদের অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য কেবল নিজের তরঙ্গ-গুলাকেই বড়ো করিয়া দেখায়, তাহারই কল্লোল বিশ্বের অন্তরতম বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নানা দিকে আমাদের নানা প্রবৃত্তি যে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে, আমাদের মনকে তাহারা একবার এ পথে একবার ও পথে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহাদের সকলকে দৃঢ়রশ্মি দ্বারা সংযত করিয়া, সকলকে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া, অন্তঃকরণের মধ্যে কর্তৃত্বলাভ করিলে, চঞ্চল পরিধির মাঝখানে অচঞ্চল কেন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া নিজেকে স্থির করিতে পারিলে, তবেই এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে যিনি শান্তং তাঁহার উপাসনা, তাঁহার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি। জীবনহীন শান্তি তো মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি তো লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচলপ্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে তাহাই শান্তি; অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত সুরকে যিনি সংগীত, সমস্ত ঘটনাকে যিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অন্যের যিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-ঋতুসংবৎসর চলিতে চলিতেও যাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে তিনিই শান্তম্। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।

বাষ্পই যে রেলগাড়ি চালায় তাহা নহে, বাষ্পকে যে স্থিরবুদ্ধি লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে সেই গাড়ি চালায়। গাড়ির কলটা চলিতেছে, গাড়ির চাকাগুলা ছুটিতেছে, তবুও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই চলাটাই কর্তা নহে; সমস্ত চলার মধ্যে অচল হইয়া যে আছে, যথেষ্টপরিমাণ চলাকে যথেষ্টপরিমাণ না-চলার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে স্থিরভাবে নিয়মিত করিতেছে, সেই কর্তা। একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞ লোক যদি প্রবেশ করে তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীয় ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্তন, লৌহদণ্ডের প্রত্যেক আস্ফালন, বাষ্পপুঞ্জের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাহার মনকে একেবারে বিভ্রান্ত করিতে থাকে; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই-সমস্ত নড়াচড়া-চলাফিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পায়—সে জানে, ভয়কে অভয় করিয়াছে কে, শক্তিকে সফল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোথায়, কর্মের মধ্যে পরিণামটা কী। সে জানে, এই শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে তাহা শান্তি; সে জানে, যেখানে এই শক্তির সার্থক পরিণাম সেখানেও শান্তি। শান্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য পাইয়া সে নির্ভয় হয়, সে আনন্দিত হয়।

এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তং তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং তিনিই শিবম্। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দাম শক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গললক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্‌গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মতো নিখিল-জগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের

ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটুকুও লক্ষযোজনদূরবর্তী সূর্যচন্দ্রগ্রহতারার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত। কেহ কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার, এক বিরাট কলেবর -রূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশ, তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে, একই পালনসূত্রে গ্রথিত। সেই রক্ষণী শক্তি, সেই পালনী শক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার এক রূপ, ক্ষতি তাহার এক রূপ, দুঃখ তাহার এক রূপ; সেই মৃত্যু ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ লাভক্ষতি সকলেরই মধ্যেই শিবং শান্তরূপে বিরাজমান। নহিলে এ-সকল ভার এক মুহূর্ত বহন করিত কে? নহিলে আজ যাহা সম্বন্ধ-বন্ধনরূপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত। যাহা আলিঙ্গন তাহাই যে পীড়ন হইয়া উঠিত। আজ সূর্য আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহতারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল স্থল আকাশ আমার মঙ্গল করিতেছে, যে বিশ্বের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূর্ণ জানি না তাহারই বিরাট প্রাঙ্গণে আমি ঘরের ছেলের মতো নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের সকলেও তেমনি আমার— ইহা কেমন করিয়া ঘটিল? যিনি এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর তিনি নিখিলের সকল আকর্ষণ, সকল সম্বন্ধ, সকল কর্মের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া, নিস্তব্ধ হইয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি শিবম্।

এই শিবস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ, শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেমনি

কর্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে না। ঔদাসীন্যে মঙ্গল নাই। কর্মসমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়: ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব, দেবদৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসারপথের দুরূহ বাধাসকল কাটাইয়া তবে সেই মঙ্গলনিকেতনের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারি— শুভকর্মসাধন দ্বারা সমস্ত ক্ষতিবিপদ-ক্ষোভবিক্ষোভের ঊর্ধ্বে নিজের অপরাজিত হৃদয়ের মধ্যে মঙ্গলকে যখন ধারণ করিব তখনই জগতের সকল কর্মের, সকল উত্থানপতনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, তিনি রহিয়াছেন যিনি শান্তং, যিনি শিবম্। তখন ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিয়াও ভয় পাইব না; নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিব সেখানেও জানিব, তিনি রাখিয়াছেন যিনি শিবম্।

তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক।

সংসারের সব-কিছুকে পৃথক করিয়া, বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু তো সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া যাই নাই, আমরা তো চিন্তা করিতে পারিতেছি; অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে তো একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে তো প্রতি মুহূর্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না; সমস্ত পৃথিবীকে তো আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে তো কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম, কত মানুষ; কত লক্ষকোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে; কিন্তু সে বোঝার ভারে আমাদের হৃদয়মন তো একেবারে পিষিয়া যায় না। কেন যায় না? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্। তাই সমস্ত ভার লঘু হইয়া গেছে। তাই মানুষের

মন আপনার সকল বোঝা নামাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেকের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাঁহাকেই যিনি অদ্বৈতম্। আমাদের সকলকে লইয়া যদি এই এক না থাকিতেন, তবে আমরা কেহ কাহাকেও কিছুমাত্র জানিতাম কি? তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকারের আদানপ্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি? তবে আমরা পরস্পরের ভার ও পরস্পরের আঘাত এক মুহূর্তও সহ্য করিতে পারিতাম কি? বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়, পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। বাস্তবিক, প্রধানত আমরা যাহা-কিছু চাই তাহার লক্ষ্যই এই ঐক্য। আমরা ধন চাই, কারণ, এক ধনের মধ্যে ছোটোবড়ো বহুতর বিষয় ঐক্যলাভ করিয়াছে; সেইজন্য বহুতর বিষয়কে প্রত্যহ পৃথকরূপে সংগ্রহ করিবার দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতা ধনের দ্বারাই দূর হয়। আমরা খ্যাতি চাই, কারণ, এক খ্যাতির দ্বারা নানা লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একেবারেই বাঁধিয়া যায়— খ্যাতি যাহার নাই, সকল লোকের সঙ্গে সে যেন পৃথক। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, পার্থক্য যেখানে মানুষের দুঃখ সেখানে, ক্লান্তি সেখানে; কারণ মানুষের সীমা সেখানেই। যে আত্মীয় তাহার সঙ্গ আমাকে শ্রান্ত করে না; যে বন্ধু সে আমার চিত্তকে প্রতিহত করে না; যাহাকে আমার নহে বলিয়া জান, সেই আমাকে বাধা দেয়, সেই হয় অভাবের নয় বিরোধের কষ্ট দিয়া আমাকে কিছু-না-কিছু পীড়িত করে। পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে, সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবা মাত্র যে আনন্দ অনুভব করি তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে

আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে।

কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং তাঁহাকেই দেখে। অন্যকে যখন আঘাত করিতে যাই, তখন সেই অদ্বৈতের উপলব্ধিকে হারাই, সেইজন্য তাহাতে দুঃখ দিই ও দুঃখ পাই; নিজের স্বার্থের দিকে যখন তাকাই তখন সেই অদ্বৈতং প্রচ্ছন্ন হইয়া যান, সেইজন্য স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত দুঃখ।

জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে শান্তকে শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্যায় উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রে কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে তাহাই আলোচনা করিয়া দেখো।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্রশক্তি মানুষের চোখে পড়ে। যতক্ষণ শান্তিতে তাহার পর্যাপ্তি দেখিতে না পাই ততক্ষণ পর্যন্ত কত ভয়, কত সংশয়, কত অমূলক কল্পনা। সকল শক্তির মূলে যখন অমোঘ নিয়মের মধ্যে দেখিতে পাই শান্তং তখন আমাদের কল্পনা শান্তি পায়। শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। মানুষ আপন অন্তঃকরণের মধ্যেও প্রবৃত্তিরূপিণী অনেকগুলি শক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করে; যতক্ষণ তাহাদের উপর কর্তৃত্বলাভ না করিতে পারে ততক্ষণ পদে পদে বিপদ, ততক্ষণ দুঃখের সীমা নাই। অতএব এই-সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ হইব, তখন জলে স্থলে আকাশে সেই শান্তস্বরূপকে দেখিব যিনি জগতের অসংখ্য শক্তিকে নিয়মিত করিয়া অনাদি-অনন্তকাল স্থির হইয়া আছেন। এইজন্য আমাদের

জীবনের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য— শক্তির মধ্যে শান্তিলাভের সাধনা।

পরে শিবম্‌। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ হয়। এইরূপে কর্ম যখন আরম্ভ করি তখন নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই আত্মপরের সংস্রবেই যত ভালোমন্দ, যত পাপপুণ্য, যত আঘাত-প্রতিঘাত। শান্তি যেমন শক্তিকে যথোচিতভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জন করিয়া দেয়, তেমনি সংসারে আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য স্থাপন করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎপ্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানবসমাজের ধ্বংস। শান্তকে শক্তিসংকুল জগতে উপলব্ধি করিতে হইবে, শিবকে সম্বন্ধসংকুল সংসারে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিবস্বরূপকে শুভকর্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে, প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে গার্হস্থ্য— প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্মের দ্বারা পরিপক্ক হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্‌।

তার পরে অদ্বৈতম। এইখানেই সমাপ্তি। শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও তো তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্‌। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্বিকার আনন্দ। মঙ্গলকর্মের সাধনায় যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতা দ্বারা, ক্ষমার দ্বারা, করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্‌। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান। তখন মানবজীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত পরিপূর্ণ; কোথাও সে আর অসংগত অসমাপ্ত অর্থহীন নহে।

হে পরমাত্মন্, মানবজীবনের সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরে একটিমাত্র গভীরতম প্রার্থনা আছে, তাহা আমরা বুদ্ধিতে জানি বা না জানি, তাহা আমরা মুখে বলি বা না বলি, আমাদের ভ্রমের মধ্যেও, আমাদের দুঃখের মধ্যেও আমাদের অন্তরাত্মা হইতে সে প্রার্থনা সর্বদাই তোমার অভিমুখে পথ খুঁজিয়া চলিতেছে। সে প্রার্থনা এই যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি। ফললাভের প্রত্যাশা সাহস করিয়া তোমাকে জানাইতে পারি না, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এইমাত্র যে, সমস্ত বিঘ্ন-বিক্ষেপ-বিকৃতির মধ্যেও এই প্রার্থনা যেন সমস্ত শক্তির সহিত সত্যভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অন্য-সমস্ত বাসনাকে ব্যর্থ করিয়া, হে অন্তর্যামিন্, আমার এই প্রার্থনাকেই গ্রহণ করো যে, আমি কদাপি যেন জ্ঞানে কর্মে প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি যে, তুমি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পৌষ ১৩১৩

স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম

মানুষকে দুই কূল বাঁচাইয়া চলিতে হয়; তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সকলের সঙ্গে মিল— দুই বিপরীত কূল। দুটির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে আমাদের মঙ্গল নাই।

স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা যে মানুষের পক্ষে বহুমূল্য তাহা মানুষের ব্যবহারেই বুঝা যায়। ধন দিয়া, প্রাণ দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার জন্য মানুষ কিনা লড়াই করিয়া থাকে।

নিজের বিশেষত্বকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সে কোথাও কোনো বাধা মানিতে চায় না। ইহাতে যেখানে বাধা পায় সেইখানেই তাহার বেদনা লাগে। সেইখানেই সে ক্রুদ্ধ হয়, লুব্ধ হয়, হনন করে, হরণ করে।

কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য তো অবাধে চলিতে পারে না। প্রথমত, সে যে-সকল মালমসলা, যে-সকল ধনজন লইয়া আপনার কলেবর গড়িয়া তুলিতে চায় তাহাদেরও স্বাতন্ত্র্য আছে; আমাদের ইচ্ছামতো কেবল গায়ের জোরে তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইতে পারি না। তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের একটা বোঝাপড়া চলিতে থাকে। সেখানে বুদ্ধির সাহায্যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা আপোষ করিয়া লই। সেখানে পরের স্বাতন্ত্র্যের খাতিরে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে কিছু পরিমাণে খাটো করিয়া না আনিলে একেবারে নিষ্ফল হইতে হয়। তখন কেবলই স্বাতন্ত্র্য মানিয়া নয়, নিয়ম মানিয়া জয়ী হইতে চেষ্টা হয়।

কিন্তু, এটা দায়ে পড়িয়া করা— ইহাতে সুখ নাই। একেবারে যে সুখ নাই, তাহা নহে। বাধাকে যথাসম্ভব নিজের প্রয়োজনের অনুগত

করিয়া আনিতে যে বুদ্ধি ও যে শক্তি খাটে তাহাতেই সুখ আছে। অর্থাৎ, কেবল পাইবার সুখ নয়, খাটাইবার সুখ। ইহাতে নিজের স্বাতন্ত্র্যের জোর, স্বাতন্ত্র্যের গৌরব অনুভব করা যায়— বাধা না পাইলে তাহা করা যাইত না। এইরূপে যে অহংকারের উত্তেজনা জন্মে তাহাতে আমাদের জিতিবার ইচ্ছা, প্রতিযোগিতার চেষ্টা বাড়িয়া উঠে। পাথরের বাধা পাইলে ঝরনার জল যেমন ফেনাইয়া ডিঙাইয়া উঠিতে চায়, তেমনি পরস্পরের বাধায় আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠে।

যাই হোক, ইহা লড়াই। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে, শক্তিতে শক্তিতে, চেষ্টায় চেষ্টায় লড়াই। প্রথমে এই লড়াই বেশির ভাগ গায়ের জোরই খাটাইত, ভাঙিয়া-চুরিয়া কাজ-উদ্ধারের চেষ্টা করিত। ইহাতে যাহাকে চাই তাহাকেও ছারখার করা হইত, যে চায় সেও ছারখার হইত; অপব্যয়ের সীমা থাকিত না। তাহার পরে বুদ্ধি আসিয়া কর্মকৌশলের অবতারণা করিল। সে গ্রন্থি ছেদন করিতে চাহিল না, গ্রন্থি মোচন করিতে বসিল। এ কাজটা ইচ্ছার অন্ধতা বা অধৈর্যের দ্বারা হইবার জো নাই; শান্ত হইয়া, সংযত হইয়া, শিক্ষিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এখানে জিতিবার চেষ্টা নিজের সমস্ত অপব্যয় বন্ধ করিয়া, নিজের বলকে গোপন করিয়া বলী হইয়াছে। ঝরনা যেমন উপত্যকায় পড়িয়া কতকটা বেগ সংবরণ করিয়া প্রশস্ত হইয়া উঠে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের বেগ তেমনি বাহুবল ছাড়িয়া, বিজ্ঞানে আসিয়া, আপনার উগ্রতা ছাড়িয়া উদারতা লাভ করে।

ইহা আপনিই হয়। জোর কেবল নিজেকেই জানে, অন্যকে মানিতে চায় না। কিন্তু বুদ্ধি কেবল নিজের স্বাতন্ত্র্য লইয়া কাজ করিতে পারে না। অন্যের মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করিয়া সন্ধান করিতে হয়— অন্যকে সে যতই বেশি করিয়া বুঝিতে পারিবে ততই নিজের কাজ

উদ্ধার করিতে পারিবে ; অন্যকে বুঝিতে গেলে, অন্যের দরজায় ঢুকিতে গেলে নিজেকে অন্যের নিয়মের অনুগত করিতেই হয়। এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা জয়ী হইতে গিয়াই নিজেকে পরাধীন না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ-পর্যন্ত কেবল প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যের জয়ী হইবার চেষ্টাই দেখা গেল। ডারউয়িনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব এই রণভূমিতে লড়াইয়ের তত্ত্ব— এখানে কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না, সকলেই সকলের চেয়ে বড়ো হইতে চায়।

কিন্তু, ক্রপট্‌কিন প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিৎরা দেখাইতেছেন যে, পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা, নিজেকে টেঁকাইয়া রাখিবার চেষ্টাই প্রাণিসমাজের একমাত্র চেষ্টা নয়। দল বাঁধিবার, পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা, ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টার চেয়ে অল্প প্রবল নহে ; বস্তুত নিজের বাসনাকে খর্ব করিয়াও পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছাই প্রাণীদের মধ্যে উন্নতির প্রধান উপায় হইয়াছে।

তবেই দেখিতেছি, এক দিকে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্তি এবং অন্য দিকে সমগ্রের সহিত সামঞ্জস্য, এই দুই নীতিই একসঙ্গে কাজ করিতেছে। অহংকার এবং প্রেম, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ সৃষ্টিকে একসঙ্গে গড়িয়া তুলিতেছে।

স্বাতন্ত্র্যেও পূর্ণতালাভ করিব এবং মিলনেও নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিব, ইহা হইলেই মানুষের সার্থকতা ঘটে। অর্জন করিয়া আমার পুষ্টি হইবে এবং বর্জন করিয়া আমার আনন্দ হইবে, জগতের মধ্যে এই দুই বিপরীত নীতির মিলন দেখা যাইতেছে। ফলত, নিজেকে যদি পূর্ণ করিয়া না সঞ্চিত করি তবে নিজেকে পূর্ণরূপে দান করিব কী করিয়া। সে কতটুকু দান হইবে! যত বড়ো অহংকার, তাহা বিসর্জন করিয়া তত বড়ো প্রেম।

এই-যে আমি, অতিক্ষুদ্র আমি, এত বড়ো জগতের মাঝখানেও সেই আমি স্বতন্ত্র। চারি দিকে কত তেজ, কত বেগ, কত বস্তু, কত ভার, তাহার আর সীমা নাই; কিন্তু আমার অহংকারকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারে নাই, আমি এতটুকু হইলেও স্বতন্ত্র। আমার যে অহংকার সকলের মধ্যেও ক্ষুদ্র আমাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে এই অহংকার যে ঈশ্বরের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহা নিঃশেষ করিয়া তাঁহাকে দিয়া ফেলিলে তবেই যে আনন্দের চূড়ান্ত। ইহাকে জাগাইবার সমস্ত দুঃসহ দুঃখের তবেই যে অবসান। ভগবানের এই ভোগের সামগ্রীটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে কে?

আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবার পূর্ববর্তী অবস্থায় যত-কিছু দ্বন্দ্ব। তখনই এক দিকে স্বার্থ, আর-এক দিকে প্রেম; এক দিকে প্রবৃত্তি, আর-এক দিকে নিবৃত্তি। সেই দোলায়মান অবস্থায় এই দ্বন্দ্বের মাঝখানেই যাহা সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলে, যাহা ঐক্যের আদর্শ রক্ষা করে, তাহাকেই বলি মঙ্গল। যাহা এক দিকে আমার স্বাতন্ত্র্য অন্য দিকে অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াও পরস্পরের আঘাতে বেসুর বাজাইয়া তোলে না, যাহা স্বতন্ত্রকে এক সমগ্রের শান্তি দান করে, যাহা দুই অহংকারকে এক সৌন্দর্যের পরিণয়সূত্রে বাঁধিয়া দেয়, তাহাই মঙ্গল। শক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বাড়াইয়া তোলে, মঙ্গল স্বাতন্ত্র্যকে সুন্দর করে, প্রেম স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয়। মঙ্গল সেই শক্তি ও প্রেমের মাঝখানে থাকিয়া প্রবল অর্জনকে একান্ত বিসর্জনের দিকেই অগ্রসর করিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের অবস্থাতেই মঙ্গলের রশ্মি লাগিয়া মানবসংসারে সৌন্দর্য প্রাতঃসন্ধ্যার মেঘের মতো বিচিত্র হইয়া উঠে।

নিজের সঙ্গে পরের, স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের যেখানে সংঘাত, সেখানে মঙ্গলকে রক্ষা করা বড়ো সুন্দর এবং বড়ো কঠিন। কবিত্ব যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর, এবং কবিত্ব যেমন কঠিন তেমনি কঠিন।

কবি যে ভাষায় কবিত্বপ্রকাশ করিতে চায় সে ভাষা তো তাহার নিজের সৃষ্টি নহে। কবি জন্মিবার বহুকাল পূর্বেই সে ভাষা আপনার একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কবি যে ভাবটি যেমন করিয়া ব্যক্ত করিতে চায়, ভাষা ঠিক তেমনটি করিয়া রাশ মানে না। তখন কবির ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাবপ্রকাশের উপায়ের স্বাতন্ত্র্যে একটা দ্বন্দ্ব হয়। যদি সেই দ্বন্দ্বটা কেবল দ্বন্দ্ব-আকারেই পাঠকের চোখে পড়িতে থাকে তবে পাঠক কাব্যের নিন্দা করে; বলে, ভাষার সঙ্গে ভাবের মিল হয় নাই। এমন স্থলে কথাটার অর্থগ্রহ হইলেও তাহা হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে না। যে কবি ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যের অনিবার্য দ্বন্দ্বকে ছাপাইয়া সৌন্দর্য রক্ষা করিতে পারেন তিনি ধন্য হন। যেটা বলিবার কথা তাহা পুরা বলা কঠিন, ভাষার বাধা-বশত কতক বলা যায় এবং কতক বলা যায় না— কিন্তু তবু সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কবির এই কাজ। ভাবের যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে সৌন্দর্য তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়।

তেমনি আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সংসারের মধ্যে প্রকাশ করিতেছি; সে সংসার তো আমার নিজের হাতে গড়া নয়; সে আমাকে পদে পদে বাধা দেয়। যেমনটি হইলে সকল দিকে আমার পুরা বিকাশ হইতে পারিত তেমন আয়োজনটি চারি দিকে নাই; সুতরাং সংসারে আমার সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্ব আছেই। কাহারও জীবনে সেই দ্বন্দ্বটাই কেবলই চোখে পড়িতে থাকে; সে কেবলই বেসুরই বাজাইয়া তোলে। আর, কোনো কোনো গুণী সংসারে এই অনিবার্য দ্বন্দ্বের মধ্যেই সংগীত সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহার সমস্ত অভাব ও ব্যাঘাতের উপরেই সৌন্দর্য রক্ষা করেন। মঙ্গলই সেই সৌন্দর্য। সংসারের প্রতিঘাতে তাঁহাদের অবাধ স্বাতন্ত্র্য-বিকাশের যে ক্ষতি হয় মঙ্গল তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। বস্তুত, দ্বন্দ্বের বাধাই মঙ্গলের সৌন্দর্যকে প্রকাশিত হইয়া

উঠিবার অবকাশ দেয়; স্বার্থের ক্ষতিই ক্ষতিপূরণের প্রধান উপায় হইয়া উঠে।

এমনি করিয়া দেখা যাইতেছে, স্বাতন্ত্র্য আপনাকে সফলতা দিবার জন্যই আপনারই খর্বতা স্বীকার করিতে থাকে; নহিলে তাহা বিকৃতিতে গিয়া পৌঁছে এবং বিকৃতি বিনাশে গিয়া উপনীত হইবেই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে মঙ্গলের অনুসরণ করিয়া প্রেমের দিকে না গেছে সেখানে সে বিনাশের দিকেই চলিতেছে। অতিবৃদ্ধি দ্বারা সে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে; কিছু দিনের মতো উপদ্রব করিয়া তাহাকে মরিতেই হয়।

অতএব, মানুষের স্বাতন্ত্র্য যখন মঙ্গলের সহায়তায় সমস্ত দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সুন্দর হইয়া উঠে তখনই বিশ্বাত্মার সহিত মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের জন্য সে প্রস্তুত হয়। বস্তুত আমাদের দুর্দান্ত স্বাতন্ত্র্য মঙ্গলসোপান হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইয়া তবেই সম্পূর্ণ হয়, সমাপ্ত হয়।

১৩১৩

ততঃ কিম্‌

আহারসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে শিখিলেই পশুপাখির শেখা সম্পূর্ণ হয়; সে জীবলীলা সম্পন্ন করিবার জন্যই প্রস্তুত হয়।

মানুষ শুধু জীব নহে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং জীবনধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওয়া, এই উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হইতে হয়।

কিন্তু, সামাজিক জীব বলিলেই মানুষের সব কথা ফুরায় না। মানুষকে আত্মারূপে দেখিলে সমাজে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। যাহারা মানুষকে সেইভাবে দেখিয়াছে তাহারা বলিয়াছে, আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে জানো। আত্মাকে উপলব্ধি করাই তাহারা মানুষের চরম সিদ্ধি বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

নীচের ধাপ বরাবর উপরের ধাপেরই অনুগত। সামাজিক জীবের পক্ষে শুদ্ধমাত্র জীবলীলা সমাজধর্মের অনুবর্তী। ক্ষুধা পাইলেই খাওয়া জীবের প্রবৃত্তি; কিন্তু সামাজিক জীবকে সেই আদিম প্রবৃত্তি খর্ব করিয়া চলিতে হয়। সমাজের দিকে তাকাইয়া অনেক সময় ক্ষুধাতৃষ্ণাকে উপেক্ষা করাই আমরা ধর্ম বলি। এমন কি, সমাজের জন্য প্রাণ দেওয়া অর্থাৎ জীবধর্ম ত্যাগ করাও শ্রেয় বলিয়া গণ্য হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, জীবধর্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্মের অনুকূল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ।

কিন্তু, মানুষের সত্যকে যাহারা এইখানেই সীমাবদ্ধ না করিয়া পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা জীবধর্ম ও সমাজধর্ম

উভয়কেই সেই আত্ম-উপলব্ধির অনুগত করিবার সাধনাকেই শিক্ষা বলিয়া জানে। এক কথায় মানবাত্মার মুক্তিই তাহাদের কাছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য; জীবনধারণ ও সমাজরক্ষার সমস্ত লক্ষ্যই ইহার অনুবর্তী।

তবেই দেখা যাইতেছে, মানুষ বলিতে যে যেমন বুঝিয়াছে সে সেই অনুসারেই মানুষের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছে— কারণ, মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।

আমরা প্রাচীন সংহিতায় ছাত্রশিক্ষার যে আদর্শ দেখিতে পাই তাহা কবে হইতে এবং কত দূর পর্যন্ত দেশে চলিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক বিচার করিতে আমি অক্ষম। অন্তত এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন তাঁহাদের মনে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল; তাঁহারা মানুষকে কী বলিয়া জানিতেন এবং সেই মানুষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কোন্ উপায়কে সকলের চেয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

সংসারে কিছুই নিত্য নয়, অতএব সংসার অসার, অপবিত্র এবং তাহাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়, এইরূপ বৈরাগ্যধর্মের শ্রেষ্ঠতা য়ুরোপে সাধুগণ মধ্যযুগে প্রচার করিতেন। তখন সন্ন্যাসিদলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। য়ুরোপের এখনকার ভাবখানা এই যে, সংসারটা কিছুই নয় বলিয়া মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা চিরস্থায়ী দেবাসুরের ঝগড়া বাধাইয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকে খর্ব করা হয়। সংসারের হিতসাধন করাই সংসারীর জীবনের শেষ লক্ষ্য— ইহাই ধর্মনীতি। এই ধর্মনীতিকে প্রবলভাবে আশ্রয় করিতে গেলে সংসারকে মায়া-ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। এই সংসারক্ষেত্রে জীবনের শেষদণ্ড পর্যন্ত পুরাদমে কাজ করিতে পারাই বীরত্ব— লাগাম-জোতা অবস্থাতেই মরা, অর্থাৎ কাজে বিশ্রাম না দিয়াই জীবন শেষ করা, ইংরেজের কাছে গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

সংসার যে অনিত্য এ কথা ভুলিয়া, মৃত্যু যে নিশ্চিত এ কথা মনের মধ্যে পোষণ না করিয়া, সংসারের সঙ্গে চিরন্তন-সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করায় য়ুরোপীয় জাতি একটা বিশেষ বললাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহার বিপরীত অবস্থাকে ইহারা morbid অর্থাৎ রুগ্ণ অবস্থা বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্ররা এমন করিয়া মানুষ হইবে যাহাতে তাহারা শেষ পর্যন্ত প্রাণপণ-বলে সংসারের কর্মক্ষেত্রে লড়াই করিতে পারে। জীবনকে ইহারা সংগ্রাম বলিয়া জানে; বিজ্ঞানও ইহাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, জীবিকার লড়াইয়ে যাহারা জেতে তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়া যায়। এক দিকে 'চাইই চাই, নহিলেই নয়' মনের এই গৃধ্নুভাবকে খুব সতেজ রাখিবার জন্য ইহাদের চেষ্টা, অপর দিকে মুঠাটাও ইহারা খুব শক্ত করিতে থাকে। আটঘাট বাঁধিয়া, রশারশি কষিয়া, দশ আঙুল দিয়া ইহারা আঁটিয়া ধরিতে জানে। পৃথিবীকে কোনো অংশেই এবং কোনোমতেই ছাড়িব না, ইহাই সবলে বলিতে বলিতে মাটি কামড়াইয়া মরিয়া যাওয়া ইহাদের পক্ষে বীরের মৃত্যু। সব জানিব, সব কাড়িব, সব রাখিব, এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা সাধন করিবার শিক্ষাই ইহাদের শিক্ষা।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি—

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।

মৃত্যু যেন চুলের ঝুঁটি ধরিয়া আছে, এই মনে করিয়া ধর্মাচরণ করিবে।

য়ুরোপের সন্ন্যাসীরাও যে এ কথা বলে নাই তাহা নহে এবং সংসারীকে ভয় দেখাইবার জন্য মৃত্যুর বিভীষিকাকে তাহারা সাহিত্যে চিত্রে এবং নানা স্থানে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু, আমাদের প্রাচীন সংহিতার মধ্যে যে ভাবটা দেখা যায় তাহার একটু বিশেষত্ব আছে।

সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের অন্ত নাই, এমন মনে করিয়া কাজ করিলে কাজ ভাল হয় কি মন্দ হয়, সে পরের কথা— কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সে কথা মিথ্যা। সংসারে আমাদের সমুদয় সম্বন্ধেরই যে অবসান আছে, এত বড়ো সত্য কথা আর-কিছুই নাই। প্রয়োজনের খাতিরে গালি দিয়া সত্যকে মিথ্যা বলিয়া চালাইলেও সে সমানে আপনার কাজ করিয়া যায়; সোনার রাজদণ্ডকেই যে রাজা চরম বলিয়া জানে তাহারও হাত হইতে চরমে সেই রাজদণ্ড ধুলায় খসিয়া পড়ে; লোকালয়ে প্রতিষ্ঠালাভকেই যে ব্যক্তি একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানে সমস্ত জীবনের সমস্ত চেষ্টার শেষে তাহাকে সেই লোকালয় একলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। বড়ো বড়ো কীর্তি লুপ্ত হইয়া যায় এবং বড়ো বড়ো জাতিকেও উন্নতির নাট্যমঞ্চ হইতে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া রঙ্গলীলা সমাধা করিতে হয়। এ-সব অত্যন্ত পুরাতন কথা, তবু ইহা কিছুমাত্র মিথ্যা নহে।

সকল সম্বন্ধেরই অবসান হয়, কিন্তু তাই বলিয়া অবসান হইবার পূর্বে তাহাকে অস্বীকার করিলে তো চলে না। অবসানের পরে যাহা অসত্য, অবসানের পূর্বে তো তাহা সত্য। যাহা যে পরিমাণে সত্য তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি, তবে হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে নয় তো কোনো দিন কোনো দিক দিয়া সুদসুদ্ধ শোধ করিয়া লইবে।

ছাত্র বিদ্যালয়ে চিরদিন পড়ে না, পড়ার একদিন অবসান হয়ই। কিন্তু যত দিন বিদ্যালয়ে আছে তত দিন সে যদি পড়াটাকে যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া লয় তবেই পড়ার অবসানটা প্রকৃত হয়, তবেই বিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। যদি সে জোর করিয়া বিদ্যালয় হইতে অবসর লয়, তবে চিরদিন ধরিয়া অসম্পূর্ণ বিদ্যার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। পথ গম্যস্থান নয় এ কথা ঠিক,

পথের সমাপ্তিই আমাদের লক্ষ্য; কিন্তু আগে পথটাকে ভোগ না করিলে তাহার সমাপ্তিটাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তবেই দেখা যাইতেছে, জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। অর্থাৎ, সকল সম্বন্ধ যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে সেইখানে পৌঁছিতে পারি। অতএব, ঠিকভাবে এই ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা—কোনো সম্বন্ধকে নাই বলিয়া বিমুখ হওয়াই সাধনা নহে। পথকে যদি বৈরাগ্যের জোরে ছাড়িয়া দাও, অপথে তবে সাতগুণ বেশি ঘুর খাইয়া মরিতে হইবে।

জর্মান মহাকবি গ্যয়টে তাঁহার ফাউস্ট্ নাটকে দেখাইয়াছেন, যে ব্যক্তি মানব-প্রবৃত্তিকে উপবাসী রাখিয়া সংসারের লীলাভূমি হইতে উচ্চে নিভৃতে বসিয়া জ্ঞানসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিল, সংসারের ধুলার উপরে বহুজোরে আছাড় খাইয়া তাহাকে কেমনতরো শক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল। মুক্তির প্রতি অসময়ে অযথা লোভ করিয়া যেটুকু ফাঁকি দিতে যাইব, সেটুকু তো শোধ করিতেই হইবে, তাহার উপরে আবার ফাঁকির চেষ্টার জন্য দণ্ড আছে। বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলেই বেশি বিলম্ব ঘটিয়া যায়।

বস্তুত গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এই দুটাই সমান সত্য —একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে। দুইকে যথার্থরূপে মিলাইতে পারিলেই তবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারা যায়। শংকর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্তি; উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায় তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ। আমাদের জীবনে যেখানেই এই শিব ও শিবানীর বিচ্ছেদ, যেখানেই বন্ধন ও মুক্তির একত্রে প্রতিষ্ঠা নাই, যেখানেই অনুরাগ ও বৈরাগ্যের বিরোধ ঘটিয়াছে, সেইখানেই যত অশান্তি, যত নিরানন্দ। সেইখানেই আমরা লইতে

চাই, দিতে চাই না; সেইখানেই আমরা নিজের দিকে টানি, অন্যের দিকে তাকাই না; সেইখানেই আমরা যাহাকে ভোগ করি তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না, অন্ত দেখিলে বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া হাহাকার করিতে থাকি; সেখানেই কর্মে আমাদের প্রতিযোগিতা, ধর্মেও আমাদের বিদ্বেষ; সেখানেই কোনো-কিছুরই যেন স্বাভাবিক পরিণাম নাই, অপঘাতমৃত্যুতেই সমস্ত ব্যাপারের অকস্মাৎ বিলোপ।

জীবনটাকে নাহয় যুদ্ধ বলিয়াই গণ্য করা গেল। এই যুদ্ধ ব্যাপারে যদি কেবল ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিদ্যাই আমাদের শেখা থাকে, ব্যূহ হইতে বাহির হইবার কৌশল আমরা না জানি, তবে সপ্তরথী ঘিরিয়া যে আমাদিগকে মারিবে। সেরূপ মরিয়াও আমরা বীরত্ব দেখাইতে পারি, কিন্তু যুদ্ধে জয় তো তাহাকে বলে না। অপর পক্ষে, যাহারা ব্যূহের মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতেই বিরত সেই কাপুরুষদের বীরের সদ্‌গতি নাই। প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়া, এই দুয়ের দ্বারাতেই জীবনের চরিতার্থতা।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন— বিশ্বচরাচর যে গ্রহণ ও বর্জন, যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়তসামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল দিকে সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল, এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

এই সামঞ্জস্যকে আশ্রয় করিতে হইলে প্রথমে মানুষকে সত্যভাবে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে কোনো-একটা বিশেষ প্রয়োজনের

দিক হইতে দেখিলে চলিবে না। আমরা যদি আম্রকে অম্বল খাওয়ার দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখি না; এইজন্য তাহার স্বাভাবিক পরিণামে বাধা ঘটাই; তাহাকে কাঁচা পাড়িয়া আনিয়া তাহার কষিটাকে মাটি করিয়া দিই। গাছকে যদি জ্বালানি কাঠ বলিয়াই দেখি, তবে তাহার ফল ফুল পাতার কোনো তাৎপর্যই দেখিতে পাই না। তেমনি মানুষকে যদি রাজ্যরক্ষার উপায় মনে করি তবে তাহাকে সৈনিক করিয়া তুলিব, তাহাকে যদি জাতীয় সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির হেতু বলিয়া গণ্য করি তবে তাহাকে বণিক করিবার একান্ত চেষ্টা করিব— এমনি করিয়া আমাদের আবহমান সংস্কার অনুসারে যেটাকেই আমরা পৃথিবীতে সকলের চেয়ে অভিলষিত বলিয়া জানি, মানুষকে তাহারই উপকরণমাত্র বলিয়া দেখিব ও সেই প্রয়োজন-সাধনকেই মানুষের সার্থকতা বলিয়া মনে করিব। এমন করিয়া দেখাতে কোনো হিত হয় না তাহা নহে, কিন্তু সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া শেষকালে অহিত আসিয়া পড়ে— এবং যাহাকে তারা মনে করিয়া আকাশে উড়াই তাহা খানিকক্ষণ ঠিক তারার মতোই ভঙ্গি করে, তাহার পরে পুড়িয়া, ছাই হইয়া, মাটিতে পড়িয়া যায়।

আমাদের দেশে একদিন মানুষকে সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে কিরূপ বড়ো করিয়া দেখা হইয়াছিল, তাহা সাধারণে-প্রচলিত একটি চাণক্য-শ্লোকেই দেখা যায়—

> ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
> গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

মানুষের আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো। অন্তত কাহারও চেয়ে ছোটো নয়। প্রথমে মানুষের আত্মাকে এইরূপে সমস্ত দেশিক ও ক্ষণিক প্রয়োজন হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ ও বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই সংসারের

সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে তাহার সত্যসম্বন্ধ, জীবনের ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান, নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়।

আমাদের দেশে তাই করা হইয়াছিল; শাস্ত্রকারগণ মানুষের আত্মাকে অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন। মানুষের মর্যাদার কোথাও সীমা ছিল না, ব্রহ্মের মধ্যেই তাহার সমাপ্তি। আর-যাহাতেই মানুষকে শেষ করিয়া দেখ তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেখা হয়— তাহাকে citizen করিয়া দেখ কিন্তু কোথায় আছে city আর কোথায় আছে সে, cityতে তাহার পর্যাপ্তি নহে; তাহাকে patriot করিয়া দেখ কিন্তু দেশেই তাহার শেষ পাওয়া যায় না, দেশ তো জলবিম্ব, সমস্ত পৃথিবীই বা কী।

ভর্তৃহরি, যিনি এক সময়ে রাজা ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন—

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্॥

সকলকাম্যফলপ্রদ লক্ষ্মীকেই নাহয় লাভ করিলে, তাহাতেই বা কী; শত্রুদের মাথার উপরেই নাহয় পা রাখিলে, তাহাতেই বা কী; নাহয় বিভবের বলে বহু সুহৃদ্ সংগ্রহ করিলে, তাহাতেই বা কী; দেহধারীদের দেহগুলিকে নাহয় কল্পকাল বাঁচাইয়া রাখিলে, তাহাতেই বা কী।

অর্থাৎ, এই-সমস্ত কামনার বিষয়ের দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না, মানুষ ইহার চেয়েও বড়ো। মানুষের সেই-যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, যাহা অনাদি হইতে অনন্তের অভিমুখ, তাহাকে মনে রাখিলে তবেই তাহার জীবনকে সজ্ঞানভাবে সম্পূর্ণতার পথে চালনা করিবার উপায় করা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষকে যদি সংসারের জীব বলিয়াই মানি, তবে তাহাকে সংসারের প্রয়োজনের

মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া, ছোটো করিয়া, ছাঁটিয়া কাটিয়া লই।

আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা মানুষের আত্মাকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ য়ুরোপের সহিত স্বতন্ত্র হইয়াছে— তাঁহারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খাটিয়া মরাকে গৌরবের বিষয় মনে করেন নাই, কর্মকেই তাঁহারা শেষ লক্ষ্য না করিয়া, কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয় করাই চরম সাধনার বিষয় বলিয়া জানিয়াছিলেন। আত্মার মুক্তিই যে প্রত্যেক মানুষের একমাত্র শ্রেয়, এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না।

য়ুরোপে স্বাধীনতার গৌরব সকল সময়েই গাওয়া হইয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থ আহরণ করিবার স্বাধীনতা, ভোগ করিবার স্বাধীনতা, কাজ করিবার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা বড়ো কম জিনিস নয়— এ সংসারে ইহাকে রক্ষা করিতে অনেক শক্তি এবং আয়োজন আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ ইহার প্রতিও অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল— ততঃ কিম্। এ স্বাধীনতাকে সে স্বাধীনতা বলিয়াই স্বীকার করে নাই। ভারতবর্ষ কামনার উপরে, কর্মের উপরেও স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু 'স্বাধীন হইলাম' মনে করিলেই তো স্বাধীন হওয়া যায় না। নিয়ম অর্থাৎ অধীনতার ভিতর দিয়া না গেলে স্বাধীন হওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে যদি বড়ো মনে কর তবে সৈনিকরূপে অধীন হইতে হইবে, বণিকরূপে অধীন হইতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কত লক্ষ সৈনিক আছে, তাহারা কি স্বাধীন? মনুষ্যত্বকে যে তাহারা মানুষ-মারা কলে পরিণত করিয়াছে, তাহারা সজীব বন্দুকমাত্র। কত লক্ষ মজুর খনির অন্ধ রসাতলে, কারখানার অগ্নিকুণ্ডে থাকিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যশ্রীর পায়ের তলায় বুকের রক্ত দিয়া আলতা পরাইতেছে। তাহারা কি স্বাধীন? তাহারা তো নির্জীব কলের সজীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। য়ুরোপে স্বাধীনতার

ফলভোগ করিতেছে কয়জন? তবে স্বাধীনতা কাহাকে বলে? individualism অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের সাধনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরতন্ত্রতা এত বেশি কি অন্যত্র দেখা গিয়াছে?

ইহার উত্তরে একটা স্বতোবিরোধী কথা বলিতে হয়। পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়াই স্বাতন্ত্র্যে যাইবার পথ। বাণিজ্যে তুমি যত বড়ো লাভের টাকা আনিতে চাও তত বড়ো মূলধনের টাকা ফেলিতে হইবে। টাকা কিছুই খাটিতেছে না, কেবলই লাভ করিতেছে, ইহা হয় না। স্বাতন্ত্র্য তেমনি সুদের মতো, বিপুল পরতন্ত্রতা খাটাইয়া তবে সেইটুকু লাভ হইতেছে— আগাগোড়া সমস্তটাই লাভ, আগাগোড়া সমস্তই স্বাধীনতা, এ কখনো সম্ভবপর নহে।

আমাদের দেশেরও সাধনার বিষয় ছিল individualism, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু, সে তো কোনো ছোটোখাটো স্বাতন্ত্র্য নয়। সেই স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ একেবারে মুক্তিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রত্যেক লোককে জীবনের প্রতি দিনের ভিতর দিয়া, সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, সেই মুক্তির অধিকার দিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপে যেমন কঠোর পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য বিকাশ পাইতেছে, আমাদের দেশেও তেমনি নিয়মসংযমের নিবিড় বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তির উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই মুক্তির পরিণামকে লক্ষ্য হইতে বাদ দিয়া যদি কেবল নিয়মসংযমকেই একান্ত করিয়া দেখি, তবে বলিতেই হয়, আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্বতা বড়ো বেশি।

আসল কথা, কোনো দেশের যখন দুর্গতির দিন আসে তখন সে মুখ্য জিনিসটাকে হারায়, অথচ গৌণটা জঞ্জাল হইয়া জায়গা জুড়িয়া বসে। তখন পাখি উড়িয়া পালায়, খাঁচা পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটিয়াছে। আমরা এখনও নানাবিধ বাঁধাবাঁধি মানিয়া

চলি, অথচ তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ নাই। মুক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে, আমাদের ইচ্ছার মধ্যে নাই, অথচ তাহার বন্ধনগুলি আমরা আপাদমস্তক বহন করিয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে আমাদের দেশের যে মুক্তির আদর্শ তাহা তো নষ্ট হইতেছেই, য়ুরোপের যে স্বাধীনতার আদর্শ তাহার পথেও পদে পদে বাধা পড়িতেছে। সাত্ত্বিকতার যে পূর্ণতা তাহা ভুলিয়াছি, রাজসিকতার যে ঐশ্বর্য তাহাও দুর্লভ হইয়াছে, কেবল তামসিকতার যে নিরর্থক অভ্যাসগত বোঝা তাহাই বহন করিয়া নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছি। অতএব এখনকার দিনে আমাদের দিকে তাকাইয়া যদি কেহ বলে, ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে কেবল আচারে-বিচারে আটে-ঘাটে বন্ধন করিবারই ফাঁদ, তবে মনে রাগ হইতে পারে কিন্তু জবাব দেওয়া কঠিন। পুকুর যখন শুকাইয়া গেছে তখন তাহাকে যদি কেহ গর্ত বলে, তবে তাহা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা, সরোবরের পূর্ণতা এক কালে যতই সুগভীর ছিল, শুষ্ক অবস্থায় তাহার রিক্ততার গর্তটাও ততই প্রকাণ্ড হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষেও মুক্তির লক্ষ্য যে একদা কত সচেষ্ট ছিল, তাহা এখনকার দিনের নিরর্থক বাঁধাবাঁধি, অনাবশ্যক আচারবিচারের দ্বারাই বুঝা যায়। য়ুরোপেও কালক্রমে যখন শক্তির হ্রাস হইবে, তখন বাঁধনের অসহ্য ভারের দ্বারাই তাহার পূর্বতন স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার পরিমাপ হইবে। এখনই কি ভার অনুভব করিয়া সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে না? এখনই কি তাহার উপায় ক্রমশ উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে না?

কিন্তু সে তর্ক থাক্; আসল কথা এই, যদি লক্ষ্য সজাগ থাকে তবে নিয়মসংযমের বন্ধনই মুক্তির একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব করিয়া বাঁধিয়াছিল। মানুষ সমাজের মধ্য

দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়াই বাঁধিয়াছিল। ঘোড়াকে তাহার সওয়ার লাগাম দিয়া বাঁধে কেন, এবং নিজেই বা তাহার সঙ্গে রেকাবের দ্বারা বদ্ধ হয় কেন— ছুটিতে হইবে বলিয়া, দূরের লক্ষ্যস্থানে যাইতে হইবে বলিয়া। ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির-অবলম্বন নহে— সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন ভারতবর্ষ বরঞ্চ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে, তাহার হাত হইতে বেশি করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে।

এইরূপে বন্ধন ও মুক্তি, উপায় ও উদ্দেশ্য, উভয়কেই মান্য করিবার কথা প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেও দেখা যায়। ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুকে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার পরে অমৃতলাভ। সংসারের ভিতর দিয়া এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তার পরে ব্রহ্মলাভের কথা; সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥

কর্ম করিয়া শতবৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই ; কর্মে লিপ্ত হইবে না, এমন পথ নাই।

মানুষকে পূর্ণতালাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন এবং সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে।

জীবনকে ও জীবনের অবসানকে, কর্মকে ও কর্মের সমাপ্তিকে এইরূপ অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে কথাটি মনে রাখিতে হইবে তাহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা-কিছু আচ্ছন্ন জানিবে।

এবং—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

তিনি যাহা ত্যাগ করিতেছেন, তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামারি থামিয়া যায়।

এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড়ো করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবননির্বাহের গোড়াকার কথা। ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শরীরকে অপবিত্র বলিয়া

পীড়া দিতে চায় নাই, সমাজকে কলুষিত বলিয়া পরিহার করিতে চায় নাই, জীবনকে অনিত্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চায় নাই— সে সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা অখণ্ড-পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল।

য়ুরোপে মানুষের জীবনের দুইটি ভাগ দেখা যায়। এক শেখার অবস্থা, তাহার পরে সংসারের কাজ করিবার অবস্থা। এইখানেই শেষ।

কিন্তু, কাজ জিনিসটাকে তো কোনো-কিছুর শেষ বলা যায় না। লাভই শেষ। শক্তিকে শুদ্ধমাত্র খাটাইয়া চলাই তো শক্তির পরিণাম নহে, সিদ্ধিতে পৌঁছানোই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু য়ুরোপ মানুষকে এমন-কোনো জায়গায় লক্ষ্য স্থাপন করিতে দেয় নাই, কাজ যেখানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের তো শেষ নাই; জগতের খবর জানিতে চাও, জানার তো অন্ত নাই; সভ্যতাকে progress বলিয়া থাক, প্রোগ্রেস শব্দের অর্থই এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলই পথে চলা, কোথাও ঘরে না পৌঁছানো। এইজন্য জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। Not the game but the chase— শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করাই য়ুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিয়া গণ্য হয়।

যাহা হাতে পাওয়া যায় তাহাতে সুখ নাই, এ কথা কি আমরাও বলি না? আমরাও বলি—

> নিঃস্বো বাষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি
> ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং আশাবধিং কো গতঃ॥

এক কথায় যে যাহা পায় তাহাতে তাহার আশা মিটে না; যতই বেশি পাও-না কেন, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার দিকে মন ছুটে। তবে আর কাজের অন্ত হইবে কেমন করিয়া। পাওয়াতে যখন চাওয়ার শেষ নহে তখন অসম্পূর্ণ আশার মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম লইয়া মরাই মানুষের একমাত্র গতি বলিয়া মনে হয়।

এইখানে ভারতবর্ষ বলিয়াছেন, আর-সমস্ত পাওয়ার এই লক্ষণ বটে, কিন্তু এক জায়গায় পাওয়ার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্য স্থাপন করি তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুটি পাইব। কোনোখানেই চাওয়ার শেষ নাই, জগৎটা এত বড়ো একটা ফাঁকি, জীবনটা এত বড়ো একটা পাগলামি হইতেই পারে না। মানুষের জীবনসংগীতে কেবলই অবিশ্রাম তানই আছে আর কোনো জায়গাতেই সম নাই, এ কথা আমরা মানি না। অবশ্য এ কথা বলিতে হইবে, তান যতই মনোহর হউক তাহার মধ্যে গানের অকস্মাৎ শেষ হইলে রসবোধে আঘাত লাগে; সমে আসিয়া শেষ হইলে সমস্ত তানের লীলা নিবিড় আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষ তাই কাজের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যুর দ্বারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেন নাই। পুরাদমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিয়া হঠাৎ অতলে তলাইয়া যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইস্টিশনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। সংসার কোনোদিন সমাপ্ত হইবে না, এ কথা ঠিক; জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত উন্নতি-অবনতির ঢেউ-খেলার মধ্য দিয়া সংসার চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের সংসারলীলার যখন শেষ আছে, তখন মানুষ যদি একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধিকে না জানিয়া প্রস্থান করে, তবে তাহার কী হইল।

বাহিরে কিছুর শেষ নাই, কেবলই একটা হইতে আর-একটা

বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই চির-চলমান বহিঃসংসারের দোলায় দুলিয়া আমরা মানুষ হইয়াছি— আমার পক্ষে একদিন সে দোলার কাজ ফুরাইলেও কোনোদিন একেবারে তাহার কাজ শেষ হইবে না। এই কথা মনে করিয়া, আমার যতটুকু সাধ্য এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ— সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু, তাই বলিয়া বাহিরের এই অশেষের মধ্যে আমিসুদ্ধ ভাসিয়া গেলে নষ্ট হইতে হইবে। অন্তরের মধ্যে একটা সমাধার পন্থা আছে। বাহিরে উপকরণের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে সন্তোষ আছে; বাহিরে দুঃখবেদনার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ধৈর্য আছে; বাহিরে প্রতিকূলতার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ক্ষমা আছে; বাহিরে লোকের সহিত সম্বন্ধভাবের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে প্রেম আছে; বাহিরে সংসারের অন্ত নাই, কিন্তু আত্মাতে আত্মা সম্পূর্ণ। এক দিকের অশেষের দ্বারাতেই আর-এক দিকের অখণ্ডতার উপলব্ধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। গতির দ্বারাতেই স্থিতিকে মাপিয়া লইতে হয়।

এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।

দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত— পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ন, ভারতবর্ষ জীবনকে সেইরূপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেমনি মানুষেরও ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশ উন্নতি এবং ক্রমশ অবনতি আছে। সেই স্বাভাবিক ক্রমকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনান্ত পর্যন্ত একটি অখণ্ড তাৎপর্যকে বহন করিয়া লইয়া গেছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল

করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

আধুনিক কালে আমরা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা বিরোধ অনুভব করি। মৃত্যু যে জীবনের পরিণাম তাহা নহে, মৃত্যু যেন জীবনের শত্রু। জীবনের পর্বে পর্বে আমরা অক্ষমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিতে থাকি। যৌবন চলিয়া গেলেও আমরা যৌবনকে টানাটানি করিয়া রাখিতে চাই। ভোগের আগুন নিবিয়া আসিতে থাকিলেও আমরা নানাপ্রকার কাঠখড় জোগাইয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়া আসিলেও আমরা প্রাণপণে কাজ করিতে চেষ্টা করি। মুষ্টি যখন স্বভাবতই শিথিল হইয়া আসে তখনও আমরা কোনোমতেই কোনো-কিছুর দখল ছাড়িতে চাই না। প্রভাত ও মধ্যাহ্ন ছাড়া আমাদের জীবনের আর-কোনো অংশকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। অবশেষে যখন আমাদের চেয়ে প্রবলতর শক্তি কানে ধরিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করায়, তখন হয় বিদ্রোহ নয় বিষাদ উপস্থিত হয়; তখন আমাদের সেই পরাভব কেবল রণে-ভঙ্গ রূপেই পরিণত হয়, তাহাকে কোনো কাজে লাগাইতেই পারি না। যে পরিণামগুলি নিশ্চয় পরিণাম, তাহাদিগকে সহজে গ্রহণ করিবার শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কিছুই নিজে ছাড়িয়া দিই না, সমস্ত নিজের কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে দিই। সত্যকে অস্বীকার করি বলিয়া পদে পদেই সত্যের নিকটে পরাস্ত হইতে থাকি।

কাঁচা আম শক্ত বোঁটা লইয়া ডালকে খুব জোরে আকর্ষণ করিয়া আছে, তাহার অপরিণত আঁটির গায়ে তাহার অপরিণত শাঁস আঁটিয়া লাগিয়া আছে। কিন্তু প্রত্যহ সে যতটুকু পাকিতেছে ততটুকু পরিমাণে তাহার বোঁটা ঢিলা হইতেছে; তাহার আঁটি শাঁস হইতে আলগা, সমস্ত ফলটা গাছ হইতে পৃথক হইয়া আসিতেছে। ফল যে একদিন গাছের

বাঁধন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে, ইহাই তাহার সফলতা; গাছকে চিরকাল আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলেই সে ব্যর্থ। ফলের মতো আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিও একদিন সংসারের ডাল হইতে সমস্ত রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষকালে এই ডালকে ত্যাগ করিয়া ধূলিসাৎ হয়। ইহা জগতের নিয়মেই হয়, ইহার উপরে আমাদের হাত নাই। কিন্তু, ভিতরে যেখানে আমাদের স্বাধীন মনুষ্যত্ব, যেখানে আমাদের ইচ্ছাশক্তির লীলা, সেখানকার পরিণতির পক্ষে ইচ্ছাশক্তিই একটা প্রধান শক্তি। এঞ্জিনের বয়লারের গায়ে যে তাপমান যন্ত্রটা আছে তাহার পারা স্বভাবের নিয়মেই ওঠে বা নামে, কিন্তু ভিতরের আগুনের আঁচটাকে এই সংকেত বুঝিয়া বাড়াইব কি কমাইব তাহা এঞ্জিনিয়ারের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও কর্মের উৎসাহকে বাড়াইব কি কমাইব, তাহা আমাদের হাতে। সেই যথাসময়ে বাড়ানো-কমানোর দ্বারাতেই আমরা সফলতা লাভ করি।

পাকা ফলে এক দিকে বোঁটা দুর্বল ও শাঁস আলগা হইতে থাকে বটে, তেমনি অন্য দিকে তাহার আঁটি শক্ত হইয়া নূতন প্রাণের সম্বল লাভ করিতে থাকে। আমাদের মধ্যেও সেই হরণ-পূরণ আছে। আমাদেরও বাহিরে হ্রাসের সঙ্গে ভিতরে বৃদ্ধির যোগ আছে। কিন্তু, ভিতরের কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা বলবান বলিয়া এই বৃদ্ধি, এই পরিণতি আমাদের সাধনার অপেক্ষা রাখে। সেইজন্যই দেখিতে পাই, দাঁত পড়িল, চুল পাকিল, শরীরের তেজ কমিল, মানুষ তাহার আয়ুর শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু কোনোমতেই সহজে সংসার হইতে আপন বোঁটা আলগা হইতে দিল না—প্রাণপণে সমস্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, এমন কি মৃত্যুর পরেও সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার ইচ্ছাই বলবান রহিবে, ইহা লইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত

পর্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিল। আধুনিক কাল ইহাকে গর্বের বিষয় মনে করে, কিন্তু ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের মর্মগত সত্য। ফুলকে পাপড়ি খসাইতেই হয়, তবে ফল ধরে; ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয়, তবে গাছ হয়। গর্ভের শিশুকে গর্ভাশ্রয় ছাড়িয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া শরীরে মনে সে নিজের মধ্যে বাড়িতে থাকে, তখন তাহার আর-কোনো কর্তব্য নাই। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি, তাহার বুদ্ধি-বিদ্যা, বাড়ার একটা সীমায় আসিলে তাহাকে আবার নিজের মধ্য হইতে সংসারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এইখানে পুষ্ট শরীর, শিক্ষিত মন ও সবল প্রবৃত্তি লইয়া সে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়। ইহাই তাহার দ্বিতীয় শরীর, তাহার বৃহৎ কলেবর। তাহার পরে শরীর জীর্ণ ও প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন সে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনাসক্ত প্রবীণতা লইয়া আপন ক্ষুদ্র সংসার হইতে বৃহত্তর সংসারে জন্মগ্রহণ করে; তাহার শিক্ষা জ্ঞান ও বুদ্ধি এক দিকে সাধারণ মানবের কাজে লাগিতে থাকে, অন্য দিকে সে অবসন্নপ্রায় মানবজীবনের সঙ্গে নিত্যজীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। তাহার পরে পৃথিবীর নাড়ির বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া দিয়া সে অতি সহজে মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও অনন্তলোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে সে শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানবজন্মকে শেষ পরিণতি দান করে।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে, আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে সেই শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনকে জীবনের পরিণামের অনুকূল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয়শিক্ষা, কেবল গ্রন্থশিক্ষা ছিল না;

তাহা ছিল ব্রহ্মচর্য। নিয়মসংযমের অভ্যাস দ্বারা এমন একটি বললাভ হইত যাহাতে ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সমস্ত জীবনই নাকি ধর্মাচরণ, কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি; সেইজন্য সেই জীবন বহন করিবার শিক্ষাও ধর্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, নিষ্ঠার সহিত, অতি সাবধানে যাপন করিতে হইত। মানুষের পক্ষে যাহা একমাত্র পরম সত্য সেই সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বালক তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত।

বাহিরের শক্তির সঙ্গে ভিতরের শক্তির সামঞ্জস্যক্রিয়া প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। গাছপালায় এই সামঞ্জস্যের কাজ যন্ত্রের মতো ঘটে। আলোকের, বাতাসের, খাদ্যরসের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহার প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। আমাদের দেহেও সেইরূপ ঘটে। জিহ্বায় খাদ্যসংযোগের উত্তেজনায় আপনি রস ক্ষরিয়া আসে, পাকযন্ত্রেও খাদ্যের সংস্পর্শে সহজেই পাকরসের উদ্রেক হয়। আমাদের শরীরের প্রাণক্রিয়া বাহিরের বিশ্বশক্তির সহজ প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু আমাদের আবার মন বলিয়া, ইচ্ছা বলিয়া আর-একটা পদার্থ যোগ হওয়াতে প্রাণের উপর আর-একটা উপসর্গ বাড়িয়া গেছে। খাইবার অন্যান্য উত্তেজনার সঙ্গে খাইবার আনন্দ একটা আসিয়াছে। তাহাতে করিয়া আহারের কাজটা শুধু আমাদের আবশ্যকের কাজ নহে, আমাদের খুশির কাজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রকৃতির কাজের সঙ্গে আমাদের একটা মানসিক সম্বন্ধ বাড়িয়া গেছে। দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরের শক্তির একটা সামঞ্জস্য প্রাণের মধ্যে ঘটিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির একটা সামঞ্জস্য মনের মধ্যে ঘটিতেছে। ইহাতে মানুষের প্রকৃতিযন্ত্রের সাধনা বড়ো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বশক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির সুর অনেক দিন হইতে বাঁধিয়া চুকিয়া গেছে, সেজন্য

বড়ো ভাবিতে হয় না, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সুর বাঁধা লইয়া আমাদিগকে অহরহ ঝঞ্চাট পোহাইতে হয়। খাদ্য সম্বন্ধে প্রাণশক্তির আবশ্যক হয়তো ফুরাইল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার তাগিদ শেষ হইল না; শরীরের আবশ্যকসাধনে সে যে আনন্দ পাইল সেই আনন্দকে সে আবশ্যকের বাহিরেও টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল— সে নানা কৃত্রিম উপায়ে বিমুখ রসনাকে রসসিক্ত করিতে ও শ্রান্ত পাকযন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল; এমনি করিয়া বাহিরের সহিত প্রাণের এবং প্রাণের সহিত মনের একতানতা নষ্ট করিয়া সে নানা অনাবশ্যক চেষ্টা, অনাবশ্যক উপকরণ ও শাখাপল্লবান্বিত দুঃখের সৃষ্টি করিয়া চলিল। আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহার সংগ্রহই যথেষ্ট দুরূহ, তাহার উপরে ভূরিপরিমাণ অনাবশ্যকের বোঝা চাপিয়া সেই আবশ্যকের আয়োজনও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়— ইচ্ছা যখন একবার স্বভাবের সীমা লঙ্ঘন করে তখন কোথাও তাহার আর থামিবার কারণ থাকে না, তখন সে 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে', কেবল সে চাই-চাই করিয়া বাড়িয়াই চলে। পৃথিবীতে নিজের এবং পরের পনেরো-আনা দুঃখের কারণ ইহাই। অথচ এই ইচ্ছাশক্তিকেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনাই আমাদের পরমানন্দের হেতু। এইজন্য ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে এক সুরে বাঁধাই আমাদের সকল শিক্ষার চরম লক্ষ্য। গোড়ায় তাহা যদি না করি তবে আমাদের চঞ্চল মনে জ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট, প্রেম কলুষিত এবং কর্ম বৃথা পরিভ্রান্ত হইতে থাকে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম বিশ্বের সহিত সহজ মিলনে মিলিত না হইয়া আমাদের আত্মম্ভরী ইচ্ছার কৃত্রিম সৃষ্টিসকলের মধ্যে মরীচিকা-অনুসরণে নিযুক্ত হইতে থাকে।

এইজন্য আমাদের আয়ুর প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্যপালন দ্বারা ইচ্ছাকে তাহার যথাবিহিত সীমার মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার অভ্যাস

করাইতে হইবে। ইহাতেই আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানসপ্রকৃতির সুর বাঁধা হইয়া আসিবে। তাহার পরে সেই সুরে তোমার সাধ্যমত ও ইচ্ছামত যে-কোনো রাগিণী বাজাও-না কেন, সত্যের সুরকে, মঙ্গলের সুরকে, আনন্দের সুরকে আঘাত করিবে না।

এইরূপে শিক্ষার কাল যাপন করিয়া সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মনু বলিয়াছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা না করিয়া সেরূপ সংযমন করা যায় না, বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া জ্ঞানের দ্বারা নিত্যশ যেমন করিয়া করা যায়।

অর্থাৎ বিষয়ে নিযুক্ত না হইলে জ্ঞান্ পূর্ণতালাভ করে না, এবং যে সংযম জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ নহে তাহা পূর্ণ সংযম নহে— তাহা জড় অভ্যাস বা অনভিজ্ঞতার অন্তরাল মাত্র; তাহা প্রকৃতির মূলগত নহে, তাহা বাহ্যিক।

সংযমের সঙ্গে প্রবৃত্তিকে চালনা করিবার শিক্ষা ও সাধনা থাকিলেই কর্ম, বিশেষত মঙ্গলকর্ম করা সহজ ও সুখসাধ্য হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম জগতের কল্যাণের আধার হইয়া উঠে। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম মানুষের মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাধা নহে, সহায় হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহস্থ যে-কোনো কর্ম করেন তাহা সহজে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন। গৃহের সমস্ত কর্ম যখন মঙ্গলকর্ম হয়, তাহা যখন ধর্মকর্ম হইয়া উঠে, তখন সেই কর্মের বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া একেবারে জর্জরীভূত করিয়া দেয় না। যথাসময়ে সে বন্ধন অনায়াসে স্খলিত হইয়া যায়, যথাসময়ে সে কর্মের একটা স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি আপনি আসে।

আয়ুর দ্বিতীয় ভাগকে এইরূপে সংসারধর্মে নিযুক্ত করিয়া শরীরের

তেজ যখন হ্রাস হইতে থাকিবে তখন এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ক্ষেত্রের কাজ শেষ হইল সেই খবরটা আসিল। শেষ হইল খবর পাইয়া চাকরি-বরখাস্ত হতভাগার মতো নিজেকে দীন বলিয়া দেখিতে হইবে না। আমর সমস্ত গেল, ইহাকেই অনুশোচনার বিষয় করিলে চলিবে না; এখন আরও বড়ো পরিধি-বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া সেই দিকে আশার সহিত, বলের সহিত মুখ ফিরাইতে হইবে। যাহা গায়ের জোরের, যাহা ইন্দ্রিয়শক্তির, যাহা প্রবৃত্তিসকলের ক্ষেত্র ছিল, তাহা এবারে পিছনে পড়িয়া রহিল—সেখানে যাহা-কিছু ফসল জন্মাইয়াছি তাহা কাটিয়া, মাড়াই করিয়া, গোলা-বোঝাই করিয়া দিয়া এ মজুরি শেষ করিয়া চলিলাম; এবার সন্ধ্যা আসিতেছে, আপিসের কুঠরি ছাড়িয়া বড়ো রাস্তা ধরিতে হইবে। ঘরে না পৌঁছিলে তো চরম শান্তি নাই। যেখানে যত-কিছু সহিলাম, কত-কিছু খাটিলাম, সে কিসের জন্য? ঘরের জন্য তো? সেই ঘরই ভূমা, সেই ঘরই আনন্দ— যে আনন্দ হইতে আমরা আসিয়াছি, যে আনন্দে আমরা যাইব। তাহা যদি না হয় তবে, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।

তাই গৃহাশ্রমের কাজ সারিয়া, সন্তানের হাতে সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া, এবার বড়ো রাস্তায় বাহির হইবার সময়। এবার বাহিরের খোলা বাতাসে বুক ভরিয়া লইতে হইবে; খোলা আকাশের আলোতে দৃষ্টিকে নিমগ্ন এবং শরীরের সমস্ত রোমকূপকে পুলকিত করিতে হইবে। এবার এক দিককার পালা সমাধা হইল। আঁতুড়ঘরে নাড়ি কাটা পড়িল, এখন অন্য জগতে স্বাধীন সঞ্চরণের অধিকার লাভ করিতে হইবে।

শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার পূর্বে কিছুকাল মাতার কাছে কাছেই থাকে। বিযুক্ত হইয়াও যুক্ত থাকে,

সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বানপ্রস্থ-আশ্রমও সেইরূপ। সংসারের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াও বাহিরের দিক হইতে সংসারের সঙ্গে সেই তৃতীয়-আশ্রমধারীর যোগ থাকে। বাহিরের দিক হইতে সে সংসারকে আপনার জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানের ফল দান করে এবং সংসার হইতে সহায়তা গ্রহণ করে। এই দান-গ্রহণ সংসারীর মতো একান্তভাবে করে না, মুক্তভাবে করে।

অবশেষে আয়ুর চতুর্থ ভাগে এমন দিন আসে যখন এই বন্ধনটুকুও ফেলিয়া একাকী সেই পরম একের সম্মুখীন হইতে হয়। মঙ্গলকর্মের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত সম্বন্ধকে পূর্ণ পরিণতি দান করিয়া আনন্দস্বরূপের সহিত চিরন্তন সম্বন্ধকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন সমস্তদিন সংসারের নানা লোকের সহিত নানা সম্বন্ধ পালন করিয়া, নানা কর্ম সমাধা করিয়া, স্বামীরই কর্ম করেন, স্বামীরই সম্বন্ধ যথার্থভাবে স্বীকার করেন; অবশেষে দিন-অবসান হইলে একে একে কাজের জিনিসগুলি তুলিয়া রাখিয়া, কাজের কাপড় ছাড়িয়া, গা ধুইয়া, কর্মস্থানের চিহ্ন মুছিয়া, নির্মল মিলনবেশে একাকিনী স্বামীর সহিত একমাত্র পূর্ণসম্বন্ধের অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য নির্জন গৃহে প্রবেশ করেন; সমাপ্তকর্ম পুরুষ সেইরূপ একে একে কাজের জীবনের সমস্ত খণ্ডতা ঘুচাইয়া দিয়া, অসীমের সহিত সম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইয়া, অবশেষে একাকী সেই একের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সম্পূর্ণ জীবনকে এই পরিপূর্ণ সমাপ্তির মধ্যে অখণ্ড সার্থকতা দান করেন। এইরূপেই মানবজীবন আদ্যোপান্ত সত্য হয়, জীবন মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে বৃথা চেষ্টা করে না ও মৃত্যু শত্রুপক্ষের ন্যায় জীবনকে আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক পরাস্ত করে না। জীবনকে আর আমরা যেমন করিয়াই খণ্ডবিখণ্ড বিক্ষিপ্ত করি, অন্য যে-কোনো অভিপ্রায়কেই আমরা চরম বলিয়া জ্ঞান করি এবং তাহাকে আমরা দেশ-উদ্ধার লোকহিত

বা যে-কোনো বড়ো নাম দিই-না কেন, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণতা থাকে না— তাহা আমাদিগকে মাঝপথে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে, তাহার মধ্য হইতে এই প্রশ্নই কেবলই বাজিতে থাকে, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্। আর, ভারতবর্ষ চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে বাল্য যৌবন প্রৌঢ়বয়স ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অনুগত করিয়া, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যেরূপ একমাত্র সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশাল বিশ্বসংগীতের সহিত মানুষের জীবন অবিরোধে সম্মিলিত হয়। বিদ্রোহ-বিরোধ থাকে না; অশিক্ষিত প্রবৃত্তি আপনার উপযুক্ত স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যে-সকল গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহারই মধ্যে বিভ্রান্ত ও নিখিলের সহিত সহজ সত্যসম্বন্ধ-ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর মধ্যে উৎপাতস্বরূপ হইয়া উঠিতে হয় না।

আমি জানি, এইখানে একটা প্রশ্ন উদয় হইবে যে, একটা দেশের সকল লোককেই কি এই আদর্শে গড়িয়া তোলা যায়? তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে, যখন ঘরে আলো জ্বলে তখন কি পিলসুজ হইতে আরম্ভ করিয়া পলিতা পর্যন্ত প্রদীপের সমস্তটাই জ্বলে? জীবনযাপন সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, যে দেশের যে-কোনো আদর্শ ই থাক্-না কেন, তাহা সমস্ত দেশের মুখাগ্রভাগেই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু পলিতার ডগাটা মাত্র জ্বলাকেই সমস্ত দীপের জ্বলা বলে। তেমনি দেশের এক অংশ মাত্র যে ভাবকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন সমস্ত দেশেরই তাহা লাভ। বস্তুত সেই অংশটুকু মাত্রকে পূর্ণতা দিবার জন্য সমস্ত দেশকে প্রস্তুত হইতে হয়, সমস্ত সমাজকে অনুকূল হইতে হয়— ডালের আগায় ফল ধরাইতে গাছের শিকড় এবং গুঁড়িকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে যদি এমন দিন আসে যে, আমাদের দেশের মাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ সত্য এবং

সর্বোচ্চ মঙ্গলকেই আর-সমস্ত খণ্ড প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তুলিয়া চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী করিয়া রাখেন, তবে তাঁহাদের সাধনা ও সার্থকতা সমস্ত দেশের মধ্যে একটা বিশেষ গতি, একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিবেই। একদিন ভারতবর্ষে ঋষিরা যখন ব্রহ্মের সাধনায় রত ছিলেন তখন সমস্ত আর্যসমাজের মধ্যেই— রাজকার্যে, যুদ্ধে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মার্চনায়— সর্বত্রই সেই ব্রহ্মের সুর বাজিয়াছিল; কর্মের মধ্যে মোক্ষের ভাব বিরাজ করিয়াছিল; ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজস্থিতি মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতেছিল, যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্। সে বাণী চিরদিনের মতোই নীরব হইয়া গেছে এমনিই যদি আমাদের ধারণা হয়, তবে আমাদের এই মৃত সমাজকে এত উপকরণ জোগাইয়া বৃথা সেবা করিয়া মরিতেছি কেন? তবে তো এই মুহূর্তেই আপাদমস্তকে পরজাতির অনুকরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়; কারণ, পরিণামহীন ব্যর্থতার বোঝা অকারণে বহিয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে সজীবভাবে কিছু-একটা হইয়া উঠার চেষ্টা করা ভালো। কিন্তু, এ কথা কখনোই মানিব না। আমাদের প্রকৃতি মানিবে না। যতই দুর্গতি হউক, আমাদের অন্তরতম স্থান এমনভাবে তৈরি হইয়া আছে যে, কোনো অসম্পূর্ণ অধিকারকে আমাদের মন পরম লাভ বলিয়া সায় দিতে পারিবে না। এখনও যদি কোনো সাধক তাঁহার জীবনের যন্ত্রে সংসারের সকল চাওয়া, সকল পাওয়ার চেয়ে উচ্চতম সপ্তকে একটা বড়ো সুর বাজাইয়া তোলেন, সেটা আমাদের হৃদয়ের তারে তখনই প্রতিঝংকৃত হইতে থাকে— তাহাকে আমরা ঠেকাইতে পারি না। প্রতাপ এবং ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতাকে আমরা যত বড়ো কণ্ঠে যত বড়ো করিয়াই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহা আমাদের মনের বহির্দ্বারে একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে

মাত্র। আমাদের সমাজে আজকাল বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে দেশী রশুনচৌকির সঙ্গে সঙ্গে একই কালে গড়ের বাদ্য বাজানো হয় দেখিতে পাই। ইহাতে সংগীত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল একটা সুরের গণ্ডগোল হইতে থাকে। এই বিষম গণ্ডগোলের ঝঞ্চনার মধ্যে মনোযোগ দিলেই বুঝা যায় যে, রশুনচৌকির বৈরাগ্যগাম্ভীর্য-মিশ্রিত করুণ শাহানাই আমাদের উৎসবের চিরন্তন হৃদয়ের মধ্য হইতে বাজিতেছে; আর গড়ের বাদ্য তাহার প্রচণ্ড কাংস্যকণ্ঠ ও স্ফীতোদর জয়ঢাকটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহংকার, কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড়ম্বরকে অভ্রভেদী করিয়া সমস্ত গভীরতর অন্তরতর সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের মঙ্গল-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা গর্বপরিপূর্ণ অসামঞ্জস্যকেই অত্যুৎকট করিয়া তুলিতেছে— তাহা আমাদের উৎসবের চিরদিনের বেদনার সঙ্গে আপনার সুর মিলাইতেছে না। আমাদের জীবনের সকল দিকেই এমনিতরো একটা খাপছাড়া জোড়াতাড়া ব্যাপার ঘটিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে; তাহার অসংগত ও ক্ষীণ অনুকরণের দ্বারা আমরা আমাদের আড়ম্বর-আস্ফালনের প্রবৃত্তিকে খুব দৌড় করাইতেছি; আমাদের দেউড়ির কাছে তাহার বড়ো জয়ঢাকটা কাঠি পিটাইয়া খুবই শব্দ করিতেছে— কিন্তু যে আমাদের অন্তঃপুরের খবর রাখে সে জানে, সেখানকার মঙ্গলশঙ্খ এই বাহ্যাড়ম্বরের ধমকে নীরব হইয়া যায় নাই, ভাড়া-করা গড়ের বাদ্য একসময় যখন গড়ের মধ্যে ফিরিয়া যায় তখনও ঘরের এই শঙ্খ আকাশে উৎসবের মঙ্গলধ্বনি ঘোষণা করে। আমরা ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বাণিজ্যনীতির উপযোগিতা খুব করিয়া স্বীকার ও প্রচার করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোনোমতেই আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিতেছে না। আমরা সকলের চেয়ে বড়ো সুর যাহা শুনিয়াছি এ সুর যে

তাহাকে আঘাত করিতেছে, আমাদের অন্তরাত্মা এক জায়গায় ইহাকে কেবলই অস্বীকার করিতেছে।

আমরা কোনোদিন এমনতরো হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয়া ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করিতেছি—ইতর হইয়া উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছি, বড়ো অক্ষরের ও উচ্চকণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর-পাঁচজনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই আছে। ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গাম্ভীর্য নাই, শিষ্টতাশীলতার সংযম নাই, শ্রী নাই। এই নকলের যুগ আসিবার পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক মর্যাদা ছিল যে, দারিদ্র্যেও আমাদিগকে মানাইত, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আমাদের গৌরব নষ্ট করিতে পারিত না। কর্ণ যেমন তাঁহার কবচকুণ্ডল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনকার দিনে আমরা সেইরূপ একটা স্বাভাবিক আভিজাত্যের কবচ লইয়াই জন্মিতাম। সেই কবচেই আমাদিগকে বহু দিনের অধীনতা ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, আমাদের সম্মান নষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, আমাদের সে সম্মান বাহিরের আহরণ-করা ধন ছিল না, সে আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল। সেই সহজাত কবচখানি আমাদের কাছ হইতে কে ভুলাইয়া লইল। ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার উপায় চলিয়া গেছে। এখন আমরা বিশ্বের মধ্যে লজ্জিত। এখন আমাদের বেশে-ভূষায় আয়োজনে-উপকরণে একটু কোথাও কিছু খাটো পড়িয়া গেলেই আমরা আর মাথা তুলিতে পারি না। সম্মান এখন বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে; তাই উপাধির জন্য, খ্যাতির জন্য আমরা বাহিরের দিকে ছুটিয়াছি, বাহিরের আড়ম্বরকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছি এবং কোথাও একটু-কিছু ছিদ্র বাহির হইবার

উপক্রম হইলেই তাহাকে মিথ্যার তালি দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু, ইহার অন্ত কোথায়? যে ভদ্রতা আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল তাহাকে আজ যদি বাহিরে টানিয়া জুতার দোকান, কাপড়ের দোকান, ঘোড়ার হাট এবং গাড়ির কারখানায় ঘোরাইতে আরম্ভ করি, তবে কোথায় লইয়া গিয়া তাহাকে বলিব, বস্, হইয়াছে, এখন বিশ্রাম করো। আমরা সন্তোষকেই সুখের পূর্ণতা বলিয়া জানিতাম; কারণ, সন্তোষ অন্তরের সামগ্রী— এখন সেই সুখকে যদি হাটে-হাটে ঘাটে-ঘাটে খুঁজিয়া ফিরিতে হয় তবে কবে বলিতে পারিব, সুখ পাইয়াছি। এখন আমাদের ভদ্রতাকে সস্তা কাপড়ে অপমান করে, বিলাতি গৃহশয্যার অভাবে উপহাস করে, চেকবহির অঙ্কপাতের ন্যূনতায় তাহার প্রতি কলঙ্কপাত করে— এমন ভদ্রতাকে মজুরের মতো বহন করিয়া গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর তাহাই আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আর যে-সকল পরিণামহীন উত্তেজনা-উন্মাদনাকে আমরা সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার দ্বারা আমাদের মতো বহির্বিষয়ে-পরাধীন জাতিকে অন্তঃকরণেও দাসানুদাস করিয়াছে।

কিন্তু তবু বলিতেছি, এই উপসর্গ এখনও আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এখনও ইহা বাহিরেই পড়িয়া আছে; এবং বাহিরে আছে বলিয়াই ইহার কলরব এত বেশি, সেইজন্যই ইহার এত আতিশয্য ও অতিশয়োক্তির প্রয়োজন হয়। এখনও এ আমাদের গভীরতর স্বভাবের অনুগত হয় নাই বলিয়াই সন্তরণমূঢ়ের সাঁতার কাটার মতো ইহাকে লইয়া আমাদিগকে এমন উন্মত্তের ন্যায় আস্ফালন করিতে হয়।

কিন্তু, একবার কেহ যদি আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া যথার্থ অধিকারের সহিত এ কথা বলেন যে, 'অসম্পূর্ণ প্রয়াসে, উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়,

অনিত্য ঐশ্বর্যে আমাদের শ্রেয় নহে— জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিণাম আছে; সকল কর্ম, সকল সাধনার একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি আছে; এবং সেই পরিণাম, সেই পরিসমাপ্তিই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র চরম চরিতার্থতা, তাহার নিকটে আর-সমস্তই তুচ্ছ'— তবে আজও এই হাট-বাজারের কোলাহলের মধ্যেও আমাদের সমস্ত হৃদয় সায় দিয়া উঠে; বলে, সত্য, ইহাই সত্য, ইহার চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই। তখন, ইস্কুলে যে-সকল ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিয়াছিলাম— কাড়াকাড়ি-মারামারির কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমানকেই সর্বোচ্চ সিংহাসনে নররক্ত দিয়া অভিষেক করিবার কথা, অত্যন্ত ক্ষীণ-খর্ব হইয়া আসে; তখন লালকুর্তিপরা অক্ষৌহিনী সেনার দম্ভ, উন্নত-মাস্তুল বৃহদাকার যুদ্ধ-জাহাজের ঔদ্ধত্য আমাদের চিত্তকে আর অভিভূত করে না; আমাদের মর্মস্থলে ভারতবর্ষের বহু যুগের একটি সজল-জলদগম্ভীর ওঙ্কারধ্বনি নিত্যজীবনের আদিসুরটিকে জগতের সমস্ত কোলাহলের ঊর্ধ্বে জাগাইয়া তুলে। ইহাকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারিব না; যদি করি তবে ইহার পরিবর্তে আমরা এমন কিছুই পাইব না যাহার দ্বারা আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, যাহার দ্বারা আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। আমরা কেবলই তরবারির ছটা, বাণিজ্যের ঘটা, কলকারখানার রক্তচক্ষু এবং স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী যে ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর আপনার উপকরণস্তূপকে উচ্চে তুলিয়া আকাশের সীমা মাপিবার ভান করিতেছে, তাহার উৎকট মূর্তি দেখিয়া সমস্ত মনে প্রাণে কেবলই পরাস্ত পরাভূত হইতে থাকিব, কেবলই সংকুচিত শঙ্কিত হইয়া পৃথিবীর রাজপথে ভিক্ষাসম্বল দীনহীনের মতো ফিরিয়া বেড়াইব।

অথচ এ কথাও আমি কোনোমতেই স্বীকার করি না যে, আমরা যাহাকে শ্রেয় বলিতেছি তাহা কেবল আমাদের পক্ষেই শ্রেয়। আমরা

অক্ষম বলিয়া, ধর্মকে দায়ে পড়িয়া বরণ করিতে হইবে, তাহাকে দারিদ্র্য গোপন করিবার একটা কৌশলস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা কখনোই সত্য নহে। প্রাচীন সংহিতাকার মানবজীবনের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র কোনো-একটি বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে। ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষেরই পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা, সংযমের দ্বারা, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে— মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্তসংগত পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়। তবেই সমুদ্র হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়া পর্বতের রহস্যগূঢ় গুহা হইতে নদীরূপে বাহির হইল, সমস্ত যাত্রাশেষে আবার তাহাকে সেই সমুদ্রের মধ্যেই পূর্ণতররূপে সম্মিলিত হইতে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি। মাঝপথে যেখানেই হউক, তাহার অকস্মাৎ অবসান অসংগত, অসমাপ্ত। এ কথা যদি অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারি তবে বলিতেই হইবে, এই সত্যকেই উপলব্ধি করিবার জন্য সকল জাতিকেই নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিয়া বারংবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রতাপ, রাজার ঐশ্বর্য, বণিকের সমৃদ্ধি, সমস্তই গৌণ; মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই মানুষের এত কালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে— নহিলে, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।

অগ্রহায়ণ ১৩১৩

আনন্দরূপ

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত। এই অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাজিত। সেখানে আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব? সেখান হইতে যে বাক্যমন নিবৃত্ত হইয়া আসে।

কিন্তু, উপনিষদ্ এ কথাও বলেন যে, এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অগোচর নহেন। কিন্তু, তিনি কই প্রকাশ পাইতেছেন? কোথায়?

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।

কোথায় প্রকাশমান, এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? যাহা অপ্রকাশিত তাহার সম্বন্ধেই প্রশ্ন চলিতে পারে, কিন্তু যাহা প্রকাশিত তাহাকে 'কোথায়' বলিয়া কে সন্ধান করিয়া বেড়ায়?

প্রকাশ কোন্‌খানে? এই-যে চারি দিকে যাহা দেখিতেছি তাহাই যে প্রকাশ। এই-যে সম্মুখে, এই-যে পার্শ্বে, এই-যে অধোতে, এই-যে ঊর্ধ্বে— এই-যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ-যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ-যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ
স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।

এই তো প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?

এই-যে যাহাকে আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে। আর তো কোনো কারণ থাকিতেই পারে না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কথাই বলিতেছে। যাহা-কিছু আছে এ সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ; সুতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আচ্ছন্ন করিবে? এমন মহান্ধকার কোথায় আছে? ইহার কণাটিকেও ধ্বংস করিতে পারে এমন শক্তি কার? এমন মৃত্যু কোথায়? এ-যে অমৃত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু, অতীত হইয়া রহিলেন কই? এই-যে দশ দিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি তো লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই। সেখানে কী ঐশ্বর্য! কী সৌন্দর্য! সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল; সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন—লোকে লোকান্তরে সে দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না, যুগে যুগান্তরে তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না। কে বলে, তাঁহাকে দেখা যায় না। কে বলে, তিনি শ্রবণের অতীত। কে বলে, তিনি ধরা দেন না। তিনিই যে প্রকাশমান: আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। সহস্র চক্ষু থাকিলেও যে দেখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না, সহস্র কর্ণ থাকিলেও শোনা ফুরাইত কবে। যদি ধরিতেই চাও তবে বাহু কত দূর বিস্তার করিলে সে ধরার অন্ত হইবে। এ যে আশ্চর্য। মানুষ-জন্ম লইয়া এই নীল আকাশের মধ্যে কী চোখই মেলিয়াছি। এ কী

দেখাই দেখিলাম। দুটি কর্ণপুট দিয়া অনন্ত রহস্যলীলাময় স্বরের ধারা অহরহ পান করিয়া যে ফুরাইল না। সমস্ত শরীরটা যে আলোকের স্পর্শে, বায়ুর স্পর্শে, স্নেহের স্পর্শে, প্রেমের স্পর্শে, কল্যাণের স্পর্শে বিদ্যুৎ-তন্ত্রীখচিত অলৌকিক বীণার মতো বারংবার স্পন্দিত-ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম। এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম। পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য অপরিমেয় প্রাচুর্যের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে, ঐশ্বর্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে, তৃণের সঙ্গে, কীটপতঙ্গের সঙ্গে, গ্রহতারা-সূর্যচন্দ্রের সঙ্গে আমরা ধন্য হইলাম।

ধূলিকে আজ ধূলি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়ো না, তৃণকে আজ তৃণজ্ঞান করিয়ো না। তোমার ইচ্ছায় এ ধূলিকে পৃথিবী হইতে মুছিতে পার না, এ ধূলি তাঁহার ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছায় এ তৃণকে অবমানিত করিতে পার না, এ শ্যামল তৃণ তাঁহারই আনন্দ মূর্তিমান। তাঁহার আনন্দ-প্রবাহ আলোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া আজ বহুলক্ষক্রোশ দূর হইতে নব-জাগরণের দেবদূতরূপে তোমার সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; ইহাকে ভক্তির সহিত অন্তঃকরণে গ্রহণ করো, ইহার স্পর্শের যোগে আপনাকে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দাও।

আজ প্রভাতের এই মুহূর্তে পৃথিবীর অর্ধভূখণ্ডে নবজাগ্রত সংসারে কর্মের কী তরঙ্গই জাগিয়া উঠিয়াছে। এই-সমস্ত প্রবল প্রয়াস, এই-সমস্ত বিপুল উদ্‌যোগে যত পুঞ্জপুঞ্জ সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদ্‌ গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দূরে দূরান্তরে হিল্লোলিত-ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে, সমস্তই কেবল তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার আনন্দ, ইহাই জানিয়া পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়ের কর্মকলরবের সংগীতকে একবার স্তব্ধ হইয়া অধ্যাত্মকর্ণে শ্রবণ করো। তার পরে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বলো, সুখে দুঃখে তাঁহারই আনন্দ, লাভে ক্ষতিতে তাঁহারই আনন্দ, জন্মে মরণে তাঁহারই

আনন্দ— সেই ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন’, ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানেন তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করিয়া, তোমার নিজের অন্তঃকরণকে একবার আনন্দে জাগাইয়া তোলো। তবেই আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি, আনন্দরূপে অমৃতরূপে যিনি চতুর্দিকেই প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আনন্দময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে। কোনো ভয়, কোনো সংশয়, কোনো দীনতা মনের মধ্যে রাখিয়ো না; আনন্দে প্রভাতে জাগ্রত হও, আনন্দে দিনের কর্ম করো, দিবাবসানে নিঃশব্দ স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আনন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া দাও; কোথাও যাইতে হইবে না, কোথাও খুঁজিতে হইবে না— সর্বত্রই যে আনন্দরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন সেই আনন্দরূপের মধ্যে তুমি আনন্দলাভ করিতে শিক্ষা করো, যাহা-কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত পূর্ণ আনন্দের সহিত তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার সাধনা করো—

সম্পদে সংকটে থাকো কল্যাণে,
থাকো আনন্দে নিন্দা অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে
চির-অমৃতনির্ঝরে শান্তিরসপানে।

নিজের এই ক্ষুদ্র চোখের দীপ্তিটুকু যদি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি তবে আকাশভরা আলো তো আর দেখিতে পাই না; তেমনি আমাদের ছোটো মনের ছোটো ছোটো বিষাদ অবসাদ নৈরাশ্য নিরানন্দ আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়— আনন্দরূপমমৃতং আমরা আর দেখিতে পাই না— নিজের কালিমা দ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি; চারি দিকে কেবল ভাঙাচোরা, কেবল অসম্পূর্ণতা, কেবল অভাব দেখি; কানা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের

মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে-সপ্তকে বাজিয়া উঠে যে আনন্দে জগদ্‌ব্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে সেখানে তাঁহাকেই দেখি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। বধে বন্ধনে, দুঃখে দারিদ্র্যে, অপকারে অপমানেও তাঁহাকেই দেখি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। তখন মুহূর্তেই বুঝিতে পারি, প্রকাশ মাত্রই তাঁহারই প্রকাশ এবং প্রকাশ মাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্। তখন বুঝিতে পারি, যে আনন্দে আকাশে আকাশে আলোক উদ্ভাসিত আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ; সেই আনন্দে আমি কাহারও চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নহি, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই, ক্ষতি নাই, অসম্মান নাই। আমি আছি, কারণ আমাতে পরিপূর্ণ আনন্দ আছেন—কে তাহার কণামাত্রও অপলাপ করিতে পারে? এমন কী ঘটনা ঘটিতে পারে যাহাতে তাহার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণতা হইবে? তাই আজ আনন্দের দিনে, আজ উৎসবের প্রভাতে, আমরা যেন সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারি—

> এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ।
> এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

এবং প্রার্থনা করি, যেন সেই আনন্দের এমন একটু অংশ লাভ করিতে পারি যাহাতে সমস্ত জীবনের প্রত্যেক দিনে সর্বত্র তাঁহাকেই স্বীকার করি— ভয়কে নয়, দ্বিধাকে নয়, শোককে নয়, তাঁহাকেই স্বীকার করি আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। তিনি প্রচুররূপে আপনাকে দান করিতেছেন, আমরা প্রচুররূপে গ্রহণ করিতে পারিব না কেন? তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যে এই-যে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন— আমরা সংকুচিত হইয়া, দীন হইয়া, অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া, সেই অবারিত ঐশ্বর্যের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? হাত বাড়াও। বক্ষকে বিস্তৃত করিয়া দাও। দুই হাত ভরিয়া, চোখ ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া অবাধ

আনন্দে সমস্ত গ্রহণ করো। তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি যে সর্বত্র হইতেই তোমাকে দেখিতেছে; তুমি একবার তোমার দুই চোখের সমস্ত জড়তা, সমস্ত বিষাদ মুছিয়া ফেলো, তোমার দুই চক্ষুকে প্রসন্ন করিয়া চাহিয়া দেখো; তখনই দেখিবে, তাঁহারই প্রসন্নসুন্দর কল্যাণমুখ তোমাকে অনন্তকাল রক্ষা করিতেছে। সে কী প্রকাশ, সে কী সৌন্দর্য, সে কী প্রেম, সে কী আনন্দরূপমমৃতম্। যেখানে দানের লেশমাত্র কৃপণতা নাই সেখানে গ্রহণে এমন কৃপণতা কেন? ওরে মূঢ়, ওরে অবিশ্বাসী, তোর সম্মুখেই সেই আনন্দমুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত প্রাণমনকে প্রসারিত করিয়া পাতিয়া ধর্; বলের সহিত বল্, 'অল্প নহে, আমার সবই চাই। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' তুমি যতটা দিতেছ আমি সমস্তটাই লইব। আমি ছোটোটার জন্য বড়োটাকে বাদ দিব না, আমি একটার জন্য অন্যটা হইতে বঞ্চিত হইব না; আমি এমন সহজ ধন লইব যাহা দশ দিক ছাপাইয়া আছে, যাহার অর্জনে আনন্দ, রক্ষণে আনন্দ, যাহার বিনাশ নাই, যাহার জন্য জগতে কাহারও সঙ্গে বিরোধ করিতে হয় না। তোমার যে প্রেম নানা দেশে, নানা কালে, নানা রসে, নানা ঘটনায় অবিশ্রাম আনন্দে অমৃতে বিকাশিত, কোথাও যাহার প্রকাশের অন্ত নাই, তাহাকেই একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারি— এমন প্রেম তোমার প্রসাদে আমার অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠুক।

যেখানে সমস্তই দেওয়া হইতেছে সেখানে কেবল পাওয়ার ক্ষমতা হারাইয়া যেন কাঙালের মতো না ঘুরিয়া বেড়াই। যেখানে আনন্দরূপমমৃতং তুমি আপনাকে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছ সেখানে চিরজীবন আমার এমন বিভ্রান্তি না ঘটে যে, সর্বদাই সর্বত্রই তোমাকে দেখিয়াও না দেখি এবং কেবল শোকদুঃখ শ্রান্তিজরা বিচ্ছেদক্ষতি লইয়া হাহাকার করিতে করিতে সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাঘ ১৩১৩

ধর্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ ১৩১৫
পুনর্মুদ্রণ ১৯১৮
শ্রাবণ ১৩৫৫

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

'ধর্ম' গদ্যগ্রন্থাবলীর ষোড়শ ভাগ রূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই শান্তিনিকেতন-আশ্রমে পৌষ-উৎসব, বর্ষশেষ, নববর্ষ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে অথবা আদিব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে কথিত বা পঠিত হইয়াছিল। 'ধর্মপ্রচার' ১৩১০ সালের "১২ই মাঘ আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সিটি কলেজ হলে পঠিত হয়" এবং 'ততঃ কিম্' "ওভারটুন হলে আহূত আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে" পঠিত হয়। প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে দেওয়া গেল—

উৎসব	বঙ্গদর্শন	১৩১২ মাঘ
দিন ও রাত্রি	বঙ্গদর্শন	১৩১০ মাঘ
মনুষ্যত্ব	বঙ্গদর্শন	১৩১০ ফাল্গুন
ধর্মের সরল আদর্শ	বঙ্গদর্শন	১৩০৯ মাঘ
প্রাচীন ভারতের একঃ	বঙ্গদর্শন	১৩০৮ ফাল্গুন
প্রার্থনা	বঙ্গদর্শন	১৩১১ আষাঢ়
ধর্মপ্রচার	বঙ্গদর্শন	১৩১০ ফাল্গুন
বর্ষশেষ[১]	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৩০৯[৩] জ্যৈষ্ঠ
নববর্ষ[২]	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৩০৯[৩] জ্যৈষ্ঠ
উৎসবের দিন	বঙ্গদর্শন	১৩১১ মাঘ
দুঃখ	বঙ্গদর্শন	১৩১৪ ফাল্গুন
শান্তং শিবমদ্বৈতম্	বঙ্গদর্শন	১৩১৩ পৌষ
ততঃ কিম্	বঙ্গদর্শন	১৩১৩ অগ্রহায়ণ
আনন্দরূপ	বঙ্গদর্শন	১৩১৩ মাঘ

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শিরোনাম : শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শিরোনাম : শান্তিনিকেতনে নববর্ষ

৩ ১৮২৪ শক

সূচীপত্র

ধর্ম